KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Enrolled No : KLMLGK 2007	Place of Publication : 20/2 (মোহনবাগান রো, কলিকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : (মোহিনী মোহন মান্না
Title : কালিকার খাতা	Size : 4.5"X7" 11.43 X 17.78 c.m.
Vol. & Number : ১৮/১০ ১৮/১১ ১৮/১২	Year of Publication : শ্রাবণ, ১৩৫৩ পৌষ, ১৩৫৩ আশ্বিন, ১৩৫৩
	Condition : Brittle Good
Editor : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

শারদীয়া চিত্রালেখা

ভাদ্র ১৩৫৩ : মূল্য ৪০ আ
August 1946 : Price 6 A

সম্পাদক :
শ্রীসজনীকান্ত দাস

কি ধর্মানুষ্ঠান, কি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও আনন্দোৎসব—স্নান আমাদের সমাজ-জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই একটি অঙ্গবিশেষ। কাজেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জীবনযাত্রাকে বিরাট একটি স্নানযাত্রার সঙ্গে তুলনা করলে অত্যুক্তি

সূচী

ভাদ্র ১৩৫৩

অহিংস বিপ্লব—শ্রীনির্মলকুমার বসু	৩১৫	শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী	৩৬২
৯ই আগষ্ট	৩৩৫	মৃগ-তৃষিকা—উমা দেবী	৩৬৬
মহাস্থবির জাতক—"মহাস্থবির"	৩৩৬	ভ্রষ্টলগ্ন—সুরুচি সেনগুপ্তা	৩৬৯
রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল	৩৫০	সত্যাগ্রহ	৩৭৭
		বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট—শ্রীবিরূপাক্ষ	৩৭৮
পদচিহ্ন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৩	রাম গল্প—"বনকুল"	৩৮০
		সংবাদ-সাহিত্য	৩৮২

শনিবারের চিঠি'র অগ্রিম চাঁদার হার

বার্ষিক ৪৸০ ও ষাণ্মাসিক ২৷৵০ ; প্রথম সংখ্যা ভি.পি.তে পাঠাইয়া চাঁদা আদায় করিতে হইলে—যথাক্রমে ৪৸৵০ ও ২৷৵০ ; প্রতি সংখ্যা রেজিস্টার্ড বুক-পোস্টে পাঠাইতে হইলে—যথাক্রমে ৭৲ ও ৩৷৷০। প্রতি সংখ্যা ডাকে ৷৵১০ ; ভি. পি.তে ৷৵০। বর্ষ আরম্ভ কার্তিক হইতে ; গ্রাহক যে কোন মাসে হওয়া যায়।

অহিংস বিপ্লব

মৌলিক প্রশ্ন

শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ আষাঢ় মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে গঠনকর্ম সম্পর্কে একটি অতিশয় সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আজ জনসাধারণ এবং শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগ্রাম চলিয়াছে। এই সংগ্রাম কখনও তীব্র আকার ধারণ করে, কখনও বা মন্দীভূত অবস্থায় চলিতে থাকে। আজ হয়তো সামরিক প্রয়োজনে গান্ধীজীর উপদেশমত আমরা ভারতবর্ষের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় শাসনের আয়ত্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারি; অর্থাৎ গ্রামগুলি যাহাতে খাওয়াপরার ব্যাপারে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, লড়াইয়ের তাগিদে হয়তো বা সে অবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতেও পারি। কিন্তু প্রশ্ন হইল, যুদ্ধ যখন শেষ হইবে, অর্থাৎ জনসাধারণের পক্ষে জয়লাভ ঘটিবে, যখন চাষী-মজুরগণের স্বার্থপোষণই রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য হইবে, তখনও কি বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা জীয়াইয়া রাখার প্রয়োজন আছে? অর্থাৎ ভবিষ্যতেও কি রাষ্ট্র হইতে স্বতন্ত্র কতকগুলি জনপ্রতিষ্ঠানের দ্বারা দেশের অর্থ নৈতিক জীবনকে পরিচালিত করিবার হেতু আছে?

প্রশ্নটি উত্থাপন-প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন, যদি তখনও সেরূপ ব্যবস্থা কায়েম থাকে তবে বুঝিতে হইবে, গান্ধীজীর মতানুসারে রাষ্ট্র এবং জনস্বার্থের মধ্যে ঐক্য কোনদিনই সম্ভব নয়। কিন্তু কংগ্রেস যে সময়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে গ্রামের পুনর্গঠনের জন্য, গঠনকর্ম প্রসারের জন্য, মন্ত্রীবৃন্দ রাষ্ট্রশক্তির প্রভাব প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অতএব ভবিষ্যৎ ভারতেও জনস্বার্থের পুষ্টিসাধনের জন্য রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সমীচীন হইবে; ও যুদ্ধকালে জনস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়া হইয়াছিল, সেগুলি অপ্রয়োজনীয় হওয়াই স্বাভাবিক হইবে; অথবা রাষ্ট্রের বিভাগ হিসাবে রূপান্তরিত হইবে।

বর্তমানে আলোচনাটি উত্থাপন করা অতিশয় সমীচীন হইয়াছে; প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিকও বটে। ইহার সংক্ষেপে সমাধান সম্ভব হইবে না ভাবিয়া একটু গোড়া হইতেই আলোচনা আরম্ভ করিব; আশা করি, ধৈর্যশীল পাঠক তজ্জন্য ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

মূলত প্রশ্নটি হইল, অহিংস সমাজব্যবস্থায় সমাজের নিয়ন্ত্রণভার রাষ্ট্রের উপরে কতখানি নির্ভর করিবে, তাহা লইয়া।

ভারতবর্ষের গ্রাম অথবা প্রদেশগুলি এক সময়ে মোটামুটি খাওয়াপরার ব্যাপারে

দূরদেশের উপরে বিশেষ নির্ভর করিত না। তখন জীবনধারণের মত প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রাম বা গ্রামের কাছাকাছি উৎপন্ন হইত, শখের জিনিস অথবা মূল্যবান প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যাহা নিত্য খরিদ করিবার আবশ্যকতা হয় না, তাহা দূরের হাট বা মেলা অথবা কোন শহর হইতে আমদানি হইত। এই ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি সুবিধা এবং কতকগুলি অসুবিধাও ছিল। সুবিধার মধ্যে, দেশে রাজার পর রাজা শাসন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু গ্রামবাসীর জীবন রাজতন্ত্রের পরিবর্তনে অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত বা ধ্বংস হয় নাই; আবার অল্পদিনের মধ্যে গ্রাম্য অর্থনৈতিক জীবনের ভারকেন্দ্র স্থিরত্ব লাভ করিয়াছে। অসুবিধার মধ্যে দুইটি প্রধান। কোন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ বা মহামারী উপস্থিত হইলে অন্য প্রদেশ হইতে দ্রুত পর্যাপ্ত পরিমাণ রসদ আমদানি করা সম্ভব হইত না; চলাচলের ব্যবস্থা আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে অতদূর উন্নতিলাভ করে নাই। দ্বিতীয়ত, ভারতের কোন অংশ বিদেশীর দ্বারা আক্রান্ত হইলে সমগ্র ভারতের পক্ষে এক হইয়া হঠাৎ শত্রুকে প্রতিহত করাও সম্ভব হইত না। আর্থিক জীবনে সকলে ছাড়া ছাড়া ভাবে থাকিবার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনেও ছাড়া ছাড়া ভাব কায়েম হইয়া ছিল; এবং হয়তো অংশত সেই কারণে মধ্যযুগে মুসলিম শক্তি অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজী ধনতন্ত্রের প্রসারকেও ভারতবাসী সম্মিলিত বাহুবলের দ্বারা প্রতিহত করিতে সমর্থ হয় নাই।

ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলে আজ ভারতবর্ষের আর্থিক জীবন এবং উৎপাদন-ব্যবস্থা এমনভাবে চালিয়া সাজা হইয়াছে, যাহার ফলে কোনও গ্রাম বা কোনও প্রদেশ, অথবা সমাজের মধ্যে কোনও শ্রেণী, এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষ, আজ যাহা উৎপাদন করে শুধু তাহা ব্যবহার করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে না। বোম্বাই বা মধ্যপ্রদেশে অপর্যাপ্ত তুলা উৎপন্ন হয়, বাংলায় কিছু ধান ও প্রচুর পাট হয়। কিন্তু বোম্বাই অথবা বাংলার তুলা বা পাট যদি যথাসময়ে বিক্রয় না হয়, তবে মানুষের দুর্গতির আর সীমা থাকে না। বাংলার চাষী অথবা বোম্বাইয়ের চাষী, কিংবা কলিকাতার পাটকলের কুলি এবং বোম্বাই ও নাগপুরের কাপড়কলের মজুরের পক্ষে আজ ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে, স্বীয় শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের উপরে নির্ভর করিয়া প্রাণধারণ সম্ভব নয়। যদি সেই সব মালের বিনিময়ে ব্যবহার্য জিনিস না পাওয়া যায়, চলাচলে ও ব্যবসায়ে বাধাবিঘ্ন ঘটে, তবে অন্নবস্ত্রের অভাবে চাষী-মজুরকে সর্বত্র বিকল হইয়া পড়িতে হয়। যে মুষ্টিমেয় শাসক-সম্প্রদায় আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের কলকাঠি নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছে, তাহার পক্ষে অন্নবস্ত্রের অভাবে দেশের জনসাধারণকে কাবু করা কিছুই কঠিন অথবা অসম্ভব হয় না।

ইহা হইতে মুক্তির দুইটি উপায় হইতে পারে। যদি ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের চাষীমজুর কোনও এক দ্রুত বিদ্রোহের ফলে রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার

উপরে অধিকার বিস্তার করিতে পারে, অর্থাৎ বর্তমান শাসকসম্প্রদায় অন্নবস্ত্রের অভাবে তাহাদিগকে কাবু করিবার পূর্বেই যদি চাষীমজুররাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তো গান্ধী-প্রদর্শিত আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের কোন প্রয়োজনই হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে সেইজন্য এমন এক শ্রেণীর বিপ্লবী আছেন যাঁহারা মনে করেন, শাসকবর্গকে পরাস্ত করিবার জন্য, ধনতন্ত্রের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা নষ্ট করিবার আবশ্যকতা নাই; চাষীমজুরকে সংঘবদ্ধ করিয়া, মাঝে মাঝে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ-ক্ষমতাকে সুসংহত করিতে হইবে এবং অবশেষে কোনও ঐতিহাসিক সুযোগের সন্ধিক্ষণে সম্মিলিত চেষ্টায় বিপুল আক্রমণের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি, অর্থাৎ সমাজের আর্থিক এবং রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকে চাষীমজুরের করায়ত্ত করিবার আয়োজন করিতে হইবে।

যাঁহারা বিপ্লবের, অর্থাৎ জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোনও কলহ থাকিতে পারে না। কিন্তু আমার বক্তব্য হইল এই যে, গান্ধীজী জনসাধারণের মুক্তির জন্য, অর্থাৎ সমাজের উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাদকবৃন্দের করায়ত্ত করিবার জন্য যে বিপ্লবপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা উপরোক্ত প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বর্তমান আলোচনার সুযোগ লাভ করিয়া, সেই প্রণালীর বিশেষত্ব কোথায়, আমি তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব। প্রসঙ্গক্রমে হিংস এবং অহিংস সংগ্রামকৌশলের মধ্যে প্রভেদ কি, আদর্শ অহিংস সমাজে বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা কতদূর বাঞ্ছনীয়, এ সকল বিষয়েও কিছু কিছু কথা উঠিবে। সমগ্র আলোচনা শেষ হইলে, তাহারই মধ্য দিয়া হয়তো সমাজ এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক-সম্বন্ধে যে মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছে, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, হিংসাকে আমি ঘৃণ্য পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করি না। মানবসমাজে পটপরিবর্তনের সময়ে ইতিহাসে বারংবার হিংসার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে; যখন কোনও শ্রেণীবিশেষের অত্যাচার নানা কারণে অসহনীয় হয়, তখন নিপীড়িত শ্রেণী মুক্তিলাভের আশায় মত্ত হইয়া হিংসার অস্ত্র ধারণ করে। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনার ফলেই মনে হইতেছে যে, হিংসার দ্বারা সমাজের ধনোৎপাদক চাষীমজুর শ্রেণীর পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিলাভ হয়তো সম্ভব হইবে না। হিংসার অস্ত্রে এমন কতকগুলি ত্রুটি আছে, যাহার ফলে সেই মুক্তির আশা এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ-চেষ্টা বার বার পরাস্ত হইয়া যাইবে। সেইজন্য হিংসার প্রতিক্রিয়া মানবশিশুর মধ্যে 'স্বাভাবিক' হইলেও অহিংসার অস্ত্রের উপরেই আমার আস্থা দিন দিন গাঢ়তর হইতেছে।

ভারী জিনিস মাধ্যাকর্ষণের বশে মাটিতে পড়িয়া যাওয়া 'স্বাভাবিক'; কিন্তু তাহার সহিত প্রকৃতির মধ্যে এমন আরও কতকগুলি গুণ বা অবস্থার ধর্ম আছে যেগুলিকে আয়ত্ত করিয়া মানুষ আজ স্বচ্ছন্দে বায়ু অপেক্ষা গুরুভার এরোপ্লেন লইয়া আকাশে হেলায় বিচরণ করিতেছে। পূর্বে কেহ এরোপ্লেন নির্মাণ করে নাই বলিয়া বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ হাল ছাড়িয়া দেন নাই। সমাজজীবনে পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারেও তেমনই যাহা কিছু সহজে ঘটে, প্রাচীনকাল হইতে ঘটিয়া আসিতেছে, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকিব কেন? যদি মনে হয়, প্রচলিত পরিবর্তন-সম্পাদনের ব্যবস্থার মধ্যে ত্রুটি রহিয়াছে, অথবা ব্যষ্টির ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে আরও উন্নত এবং ফলপ্রদ উপায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তবে সমষ্টির বেলাতেই বা অপেক্ষাকৃত অধিক কার্যকরী এবং নির্দোষ উপায় উদ্ভাবনের জন্য কেন চেষ্টা করা হইবে না? যদি বহুবার বিফলতা আমাদিগকে আক্রমণ করে, তবু সর্বোত্তম প্রণালী অনুসন্ধান বা উদ্‌ভাবনের চেষ্টায় যেন আমরা কখনও নিরুৎসাহ না হই। সফল হইলে, আমরা এরোপ্লেনের মত বিস্ময়কর বস্তুই হয়তো সৃষ্টি করিতে পারিব; যাহা আপাতদৃষ্টিতে 'স্বাভাবিক' নিয়মের বা অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যাহা বস্তুত 'স্বভাব' অথবা মানবপ্রকৃতি এবং মানবসমাজের সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর এবং সত্যতর জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ-পদ্ধতিকে আমি সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবাত্মক আবিষ্কার বলিয়াই বিবেচনা করি। সেই সত্যাগ্রহ অথবা অহিংস বিপ্লবপন্থার স্বরূপ কি, অর্থাৎ তাহার বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহা এইবার নিবেদন করিবার চেষ্টা করিব।

বিভিন্ন বিপ্লবপন্থায় জনসাধারণ তথা পার্টির স্থান এবং স্বরূপ

ধনতন্ত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছিল। যাহারা সমাজের জীবনকে পরিচালিত করে, তাহারা উৎপাদক শ্রেণীর তুলনায় সংখ্যায় অল্প হইলেও জনসমাজের জীয়নকাঠি মরণকাঠির কেন্দ্রস্বরূপ রাষ্ট্রশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। অবশ্য সেই শক্তি তাহারা স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থপুষ্টির জন্য নিয়োজিত করে; কিন্তু রাষ্ট্রই যে নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয় শক্তির আধার হইয়া আছে, ইহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। সেই ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকবৃন্দকে যদি দ্রুত পরাস্ত করিতে হয়, তবে তাহাদের শক্তির কেন্দ্র কোথায়, অর্থাৎ সেই শ্রেণীর মধ্যে আবার শক্তির ভারকেন্দ্র কোন্ উপশ্রেণীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কাহার মধ্যে বিপ্লবী সম্ভাবনা সমধিক বর্তমান, আক্রমণের সন্ধিক্ষণ কখন উপস্থিত হয় তাহার বিচার করিবার, এবং উৎপাদক শ্রেণীর শক্তি এবং আক্রমণকে তদনুযায়ী পরিচালিত করিবার জন্য কিছু বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আছে; অন্যথা চাষীমজুরের দুঃখবোধ এবং বিদ্রোহের সম্ভাবনা বর্তমান থাকিলেও

জয়ের আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। মার্ক্সপন্থী যাবতীয় মনীষীবৃন্দ সেইজন্য বলিয়াছেন, চাষীমজুরকে পরিচালিত করিবার জন্য, তাহাদের অন্তরস্থ বিদ্রোহের বহ্নিকে সংহত এবং পুঞ্জীভূত ও সার্থক করিবার জন্য বিপ্লবে দক্ষ এক সুসংবদ্ধ পার্টির একান্ত প্রয়োজন। শুনিয়াছি, মার্ক্সের নিজের নাকি ধারণা ছিল যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে নিপীড়িত জনসাধারণের মধ্য হইতেই উপযোগী নেতৃত্বের আবির্ভাব হইবে। পরবর্তী কালে, ঐতিহাসিক এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে লেনিন অনুভব করেন, বিপ্লব পরিচালনার জন্য সুনিয়ন্ত্রিত পার্টির একান্ত প্রয়োজন। আজ মার্ক্সবাদী সকলেই বোধ হয় নিরপেক্ষভাবে পার্টির প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করেন; তদভাবে ধূর্ত, শক্তিশালী এবং সুসংবদ্ধ ধনতান্ত্রিক শক্তির নাগপাশ হইতে জগতে জনসাধারণের মুক্তি সম্ভব নয়।

গান্ধীজী কিন্তু মনে করেন, যদি সশস্ত্র বিপ্লবের সার্থকতা পার্টির উপরে একান্তভাবে নির্ভর করে, তবে বিপ্লবের অন্তে যখন ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটিবে, যখন বর্তমান শাসক-শ্রেণীর অধিকার হইতে দণ্ডশক্তি বিচ্যুত হইবে, তখন সেই শক্তি পার্টির অধিকারে কেন্দ্রীভূত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। বিপ্লবে যাহারা অস্ত্রচালনায় দক্ষতা অর্জন করিয়াছে বা গুরু দায়িত্বের ভার লইয়াছে, সেই শ্রেণী বা সংঘ প্রধানত দণ্ডশক্তির অধিকারী হইবে। মার্ক্সপন্থী গান্ধীজীর সঙ্গে সহমত হইয়া বলিবেন, 'নিশ্চয়ই, ক্ষমতা তো পার্টির হাতে আসিবেই। কিন্তু পার্টি সে ক্ষমতা জনসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ অধিকার করিয়া থাকিবে, এবং সেই ক্ষমতায় সুনিপুণ প্রয়োগের দ্বারা প্রতিবিপ্লবের সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবে। জগৎসমাজে সর্বত্র ধনতন্ত্রের বিষদাঁত ভাঙিয়া গেলে দণ্ডশক্তির উপরে আর নির্ভর করিবার প্রয়োজন হইবে না; উৎপাদকশ্রেণী ধীরে ধীরে শিক্ষিত এবং সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিলে, সকল প্রতিবিপ্লবী শক্তির অবসান ঘটিলে, নিরঙ্কুশ-ভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় আসিবে। তখন পার্টির দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রের আর প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না, রাষ্ট্র ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে নিশ্চিহ্ন হইবে। তখন সমাজের পরিচালনভার দণ্ডশক্তির উপরে আর নির্ভর করিবে না; তৎপরিবর্তে মানুষ নিজের সুবিধামত, স্বেচ্ছাধীন নানা নূতন প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়া সমাজ এবং ব্যক্তির কল্যাণের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবে।

কিন্তু একটি প্রশ্ন থাকিয়াই যায়; দণ্ডশক্তি প্রয়োগে সুনিপুণ সেই পার্টি যে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ আচরণ করিবে, ইহার স্থিরতা কোথায়? রুশিয়ার বর্তমান ইতিহাসের আলোচনা করিলে এ সম্বন্ধে বিশেষ ভরসা পাওয়া যায় না। বিপ্লবের পরবর্তীকালে সেখানে যাহা ঘটিয়াছে তাহার সম্পর্কে কেহ বলেন, ট্রট্স্কি ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, আবার কাহারও মতে ষ্টালিনই বিপ্লবকে পথচ্যুত করিয়াছেন। সে তর্ক ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই,

রুশদেশে পুরাতন শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করিয়া যে বীর ত্যাগী কর্মীবৃন্দ সমাজতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্তত অর্ধেকের পক্ষে পথভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব হয় নাই। আর প্রগতিশীল কর্মীবৃন্দেরই সদা জয় হইবে, ইহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? জার্মানি স্পেন প্রভৃতি দেশে তাহার ব্যতিক্রমের ইতিহাস অপরিচিত নয়।

এই সকল কারণে গান্ধীজী এমন একটি কর্মপন্থা উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করেন, যাহার মধ্যে শত্রুকে নিপীড়নশক্তির দ্বারা পরাস্ত না করিয়া মানুষ স্বীয় সহ্যগুণের বলে জয়লাভ করিতে পারে। অর্থাৎ দণ্ডশক্তি এবং দণ্ডশক্তির প্রয়োগে সুনিপুণ পার্টির পরিচালনার উপরে নির্ভর না করিয়া জনসাধারণ স্বীয় সহনশক্তি, দৃঢ়তা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের উপরেই বেশি নির্ভর করিবে। বিপ্লবের সাফল্য প্রধানত এরূপ শক্তির উপরে নির্ভর করিলে সংগ্রামের অন্তে ক্ষমতাও প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের আয়ত্তে আসা সম্ভব হয়, এবং উত্তরকালে ক্ষমতার কোনও অপপ্রয়োগ হইলে জনসাধারণের পক্ষে স্বীয় অসহযোগের দ্বারা কেন্দ্রীয় কর্মচারীবৃন্দকে সংযত ও আয়ত্তাধীন রাখা সম্ভব হয়। ইহাকেই গান্ধীজী প্রকৃত স্বাধীনতা বা স্বরাজ আখ্যা দিয়াছেন।

তবে কি বুঝিতে হইবে যে, গান্ধীজী বিপ্লবের সাফল্যের জন্য নেতৃত্বে আদৌ বিশ্বাস করেন না? তাহাই যদি হয়, তবে তিনি কংগ্রেসকে এত শক্তিশালী করিতে চান কেন? কংগ্রেসের নেতৃত্ব বা নির্দেশ ভিন্ন আইন-অমান্য নিষেধ করিবারই বা অর্থ কি? সেখানে উত্তর হইল এই যে, পার্টির বা বাহিরের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ষোলো আনা স্বীকার করেন না বলিয়া এক আনাও স্বীকার করেন না, ইহা ঠিক নহে। দ্বিতীয়ত, তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী নেতৃত্বের ধরনও ভিন্ন হইবে। জনসাধারণের মধ্যে দুঃখের বোধকে জাগ্রত করিবার জন্য; পুরুষকারের দ্বারা সেই দুঃখের নিবৃত্তি ঘটিতে পারে, ইহা শিখাইবার জন্য; ধনতন্ত্রের নাগপাশকে বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা কি ভাবে শিথিল করা যায়, তাহা বুঝাইয়া উপযুক্ত সংঘশক্তি এবং লোকায়ত্ত প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য কংগ্রেসের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। শুধু তাহাই নয়; যখন আইন-অমান্যের আন্দোলন আরম্ভ হইবে, তখন জনসাধারণের পক্ষে পর পর কি কি কর্তব্যের উদয় হইবে, সে সম্বন্ধেও কংগ্রেসকর্মীগণ পূর্বাহ্নে জনসাধারণকে সঙ্কেত দিয়া রাখিবেন। এবং সকলের চেয়ে বড় কথা হইল, শাসকবৃন্দ যখন নিপীড়নের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিবে, তখন সহ্যগুণের অমোঘ বর্ম পরিধান করিয়া তাঁহাদিগকেই জনসমাজের সম্মুখে 'আগে হাঁটার' দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। এই জাতীয় নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা শাসনের দ্বারা জনসাধারণকে পরিচালিত করিবেন না, তাহাদিগকে সুকৌশলে যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মারফৎ আত্মনিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত করিয়া তুলিবেন।

যে পার্টি হিংসার অস্ত্রের উপর নির্ভর করে, তাহাকে জনসমূহের পরিচালন-ব্যাপারেও

অল্পবিস্তর হিংসা এবং নিষ্ঠুরতার আশ্রয় লইতে হয়; ইহার দ্বারা জনসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অনেকাংশে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। উপরন্তু পার্টির মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে তাহা নিরসনের জন্য হিংসার ব্যবহারও বিচিত্র নয়; ফলে কর্মীগণের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাধারা ও বিচারশক্তি এবং কর্মপ্রবৃত্তির স্ফূর্তির পথে যথেষ্ট বাধা জন্মে। কিন্তু গান্ধীজীর বিপ্লবপন্থায় কংগ্রেসের যে নেতৃত্ব তিনি গড়িয়া তুলিতে চান, তাহা শাসনশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। অর্থাৎ কর্মীগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাহার নিরসন করিতে হইবে। বিরুদ্ধ মতের সঙ্গতি সম্ভব না হইলে কংগ্রেসকে সংখ্যাধিক্যের মতানুসারে চালিত করিয়া, অপরকে কংগ্রেসের বাহিরে গিয়া স্বীয় মতানুযায়ী কাজ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, তাহাকে শাসনের দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা হইবে না। জনশক্তির পরিচালনেও উপরোক্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরই প্রয়োগ করা হইবে। এইরূপে গান্ধীজী কংগ্রেসের যে নৈতিক নেতৃত্ব বা 'মর‍্যাল লীডারশিপ' গড়িয়া তুলিতে চান, তাহার দ্বারা কঠিন পার্টির একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনা যে অনেক কম, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তদুপরি দণ্ডশক্তির পরিবর্তে সহনশক্তিই যেখানে প্রধান আশ্রয়, সেখানে বিজয়লাভ ঘটিলে জনসাধারণের পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা সহজ হয় যে, প্রধানত তাহাদেরই দৃঢ়তা এবং সহ্যগুণের ফলে সাফল্যলাভ ঘটিয়াছে, নেতৃস্থানীয় কর্মীবৃন্দের কোন গোপন দক্ষতার ফলে নয়। অর্থাৎ বিপ্লবে এমন কোনও শক্তির প্রয়োজন হয় নাই, যাহা তাহাদের স্বকীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ত্তের বহির্ভূত।

কার্যত উপরোক্ত বিপ্লব সফল হইতে পারে কি না, অথবা সাধারণ মানুষের পক্ষে অহিংস থাকা সম্ভব কি না, তাহা আজ আমাদের বিচার্য নহে। গান্ধীজী যে বিপ্লবপন্থার পরিকল্পনা করেন, তাহার লক্ষণ নির্দেশ করাই আমার উদ্দেশ্য। মার্ক্সীয় বিপ্লবশাস্ত্রে শুনিয়াছি এক সময়ে ধারণা ছিল যে, শিল্পে সমুন্নত দেশগুলিতে শিল্পবিস্তারের ফলে সর্বহারা প্রলেটারিয়েট-শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত বিপ্লবের সম্ভাবনাও ঘনায়মান হইবে। কিন্তু উত্তরকালে শাস্ত্রকারগণ নাকি বলিয়াছেন, জগৎজোড়া ধনতন্ত্রপ্রসারের ফলে যখন চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের মত গোটা দেশকে প্রলেটারিয়েটের অবস্থায় অবনমিত করা হয়, তাহাদের স্বাভাবিক উন্নতি রোধ করিয়া শিল্পবিদ্যায় পশ্চাৎপদ রাখা হয়, সেরূপ শোষিত কাঁচা-মাল-উৎপাদনকারী দেশেও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযানের আরম্ভ কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। হয়তো ধনতন্ত্রের নাগপাশ সেইখানেই প্রথম ছিন্ন হইতে আরম্ভ করিবে।

গান্ধীজীর বিপ্লবপন্থায় কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য হইল, এমন এক কর্মকৌশল উদ্ভাবন করা যাহার সার্থকতা সর্বহারা প্রলেটারিয়েট-শ্রেণীর সংখ্যাধিক্যের উপরে নির্ভর করিবে না, কিন্তু যাহা দরিদ্র, শোষিত জনসাধারণের স্বাধীনতাস্পৃহা এবং সংকল্পের দৃঢ়তার উপরেই প্রধানত নির্ভর করিবে। গান্ধীবাদের বিচারকালে যদি আমরা তাঁহার নিকট ঋণতার

মত অচঞ্চল এই লক্ষ্যটির সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকি, তবে তিনি কেন হিংসার অস্ত্র পরিহার করেন, গোপনীয়তা সর্বতোভাবে বর্জন করিতে বলেন, উৎপাদন-ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীসাধনের উপদেশ দেন, ইহার সবই তখন একে একে স্পষ্ট হইয়া ওঠে; এবং অহিংস বিপ্লবের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব এবং সহজ হয়।

বিকেন্দ্রীকরণের ফলে আত্মশক্তির বিকাশ

গান্ধীজী খাদিকে কেন্দ্রে রাখিয়া গ্রামের যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা গড়িতে চান তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি হইল, ধনতন্ত্রের চাপে সেরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্যজীবন প্রতিষ্ঠিত করা আজ আর সম্ভব নয়। আর যদি বা কোন প্রকারে সম্ভবও হয়, তাহা হইলে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের ফলে সমগ্র জগতে যে শিল্পোন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা হইতে মানুষকে আবার বঞ্চিত করিয়া বর্বর কৃষিপ্রধান যুগে ফিরিয়া যাইতে হয়। তাহা ছাড়া, ধনতন্ত্রের লোভনীয় আকর্ষণের নিকট ঐরূপ উৎপাদন-ব্যবস্থার পক্ষে যেমন পরাস্ত হওয়া সম্ভব, উহার সামরিক শক্তির আঘাতের সম্মুখেও তেমনই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম বা প্রদেশের পক্ষে, এমন কি কোন দেশের পক্ষেই একা আর আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

প্রথমে উৎপাদন বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে যুক্তিবিস্তার করিয়া আমরা পরে একে একে অন্য প্রসঙ্গগুলির বিষয়ে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

দেশে এমন এক শ্রেণীর কর্মী আছেন, যাঁহারা ভারতবর্ষের গ্রামসংগঠনের জন্য বর্তমান অবস্থায় চরকাকে আশ্রয় করিতে আপত্তি করেন না; অথচ বাস্তবিক হয়তো তাঁহারা ভবিষ্যৎ ভারতে কলকারখানার যথেষ্ট উন্নতি দেখিতে চান। এরূপ কর্মীদের মধ্যে চরকার সপক্ষে একটি যুক্তির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ভারতের পল্লী অঞ্চলে অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষিজীবীর নিকটে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিতে গেলেও দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে উপযোগী কোনও অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা উপলক্ষ্য করিয়া যাওয়া মন্দ হয় না। সে দিক দিয়া বিবেচনা করিলে চরকা ও খাদি এবং গ্রামোদ্যোগের অন্যান্য যাবতীয় চেষ্টাকে সমর্থন করা যায়। কিন্তু উপরোক্ত মনোভাববিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীগণ অনেক ক্ষেত্রে গৃহশিল্পের দ্রুত প্রসারের জন্য গ্রামের বাহির হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন না; কারণ আর্থিক উন্নতিবিধানের দ্বারা বহুসংখ্যক পল্লীবাসীর মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করা তাঁহাদের একটি লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। পরে তাঁহারা সেই প্রভাব অবলম্বন করিয়া জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার এবং সংগ্রামের জন্য সংগঠনের চেষ্টাও করেন।

কিন্তু গান্ধীজী গঠনকর্মের মধ্যে এরূপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টাকে নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন। বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ ইহা নহে যে বাহিরের লোকবল, বাহিরের

অর্থবলকে আশ্রয় করিয়া যেমন তেমন উপায়ে গ্রামদেশে অন্নবস্ত্রের একটি উৎপাদন-ব্যবস্থাকে খাড়া করা। তাহার চেয়ে বড় কথা হইল, পল্লীবাসীগণকে আলস্য এবং পরস্পরের সহিত অসহযোগের বিষক্রিয়া হইতে মুক্ত করিয়া স্বীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তে অর্থনৈতিক জীবনকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করিবার শিক্ষা দেওয়া। গ্রামের অন্নবস্ত্রের অভাব মিটাইবার চেষ্টায়, গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন করিয়া উন্নত জীবনব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় যে পরিবর্তন সাধিত হইবে, তাহাই গঠনকর্মীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

যদি কংগ্রেসকর্মীগণের উৎসাহদীপ্ত, বুদ্ধিযুক্ত, অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ভারতের দরিদ্রতম পল্লীবাসী এবং অবমানিত সামাজিক শ্রেণীর জীবনে এইরূপ বিপ্লব সাধন করা সম্ভব হয়, তবে বর্তমান ধনতন্ত্রের আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য আইন-অমান্যের প্রয়োজন হইলে, যদি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া যায়, প্রাদেশিক কংগ্রেসের পক্ষেও আন্দোলনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নির্দেশ দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহা হইলে প্রধানত স্বীয় শক্তি এবং পরিচালনক্ষমতার উপরে নির্ভর করিয়া ছোট ছোট গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে অগ্রসর হওয়া কি সম্ভব হইবে না? হয়তো তাহারা স্বীয় বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে ছোটখাট আইন-অমান্য হইতে আরম্ভ করিয়া খাজনা-ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন পর্যন্ত কংগ্রেসের পূর্বপ্রদত্ত নির্দেশানুযায়ী চালাইয়া যাইতে সমর্থ হইবে।

অর্থাৎ গান্ধীজী যখন বিকেন্দ্রীকরণের উপদেশ দেন, তাহা শুধু আর্থিক জীবনে উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার জন্য নয়, বরং তাহার প্রভাব মানুষের নবলব্ধ সামাজিক শক্তি ও পরিচালন-ক্ষমতার মধ্যে স্পষ্টতর ফুটিয়া উঠুক, ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। আর্থিক জীবনে যেমন গান্ধীজী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী, সত্যাগ্রহের পরিচালনাতেও তিনি তেমনই স্বাবলম্বনের পক্ষপাতী। বিভিন্ন কেন্দ্র মূলত একই নীতি-অনুযায়ী অগ্রসর হইবে বটে; কিন্তু প্রত্যেককে স্বীয় শক্তি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া চলার মাত্রা নিরূপণ করিতে হইবে। সকল নদী সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হয় সত্য, কিন্তু প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে নিজের পথ রচনা করিয়া লইতে হয়। সকলেই আকাশের বারিধারার উপরে শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে, সকল কেন্দ্রকেই মূলনীতির বিষয়ে কংগ্রেসের অধীন থাকিতে হয় সত্য, কিন্তু চলার দায়িত্ব, বিভিন্ন নদীপথের মত, প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে স্থির করিয়া লইতে হয়।

বিকেন্দ্রীকরণের দ্বিতীয় যুক্তি ও যুদ্ধ এবং সত্যাগ্রহের মধ্যে ভেদ

বিপ্লবী পাঠক হয়তো বলিবেন, হিংসার যুদ্ধেও তো ক্ষেত্রবিশেষে বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষে জনসাধারণের অবস্থা বিবেচনা করিয়া হয়তো অহিংস সংগ্রামেও

এরূপ আয়োজন মন্দ নয়। কিন্তু তাহার জন্য এত আড়ম্বর কেন? উৎপাদন-ব্যবস্থাকে পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন কি? তাহাতে সংগ্রামকে অকারণ বিলম্বিত করা হয়, এবং জনসাধারণের দৃষ্টি ও উৎসাহ একান্তভাবে সংগ্রামের দ্রুতসিদ্ধির উপরে নিবদ্ধ না থাকিয়া আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের অপ্রয়োজনীয় চেষ্টার অরণ্যপথে দিশাহারা হইয়া পড়ে, ফলে সংগ্রামেরই ক্ষতি হয়। কয়টা খাদি-কেন্দ্র সত্যাগ্রহের ব্যাপারে অগ্রণী হইয়াছে?

উত্তরে প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, গান্ধীজী যে-ধরনের মনোভাব খাদি বা গ্রাম-উদ্যোগ প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া গড়িতে চান, বহু খাদি-কর্মীর মনে সে-সম্বন্ধে ধারণা অস্পষ্ট থাকায়, অথবা কোন ধারণা না থাকায়, তাঁহারা বাহিরের বাজার, অর্থবল, লোকবল এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রণের ফলে যথাযথ মনোভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন নাই। ইহা সত্য বটে; কিন্তু সম্যক উদ্দেশ্য লইয়া সম্যক চেষ্টার দ্বারা উপযুক্ত মনোভাব এবং তদনুযায়ী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায় না, এরূপ সিদ্ধান্তেরও কোন সঙ্গত কারণ নাই।

অতঃপর বিলম্বের প্রশ্ন এবং দ্রুতসিদ্ধিলাভের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে যুদ্ধ এবং সত্যাগ্রহের মধ্যে একটি গুরুতর প্রভেদের বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক।

যুদ্ধ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যতিক্রম, এ-বিষয়ে কোন মতভেদ নাই; সে যুদ্ধ জনসাধারণের মুক্তির উদ্দেশ্যেই আরম্ভ হউক, অথবা বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার ফলেই আরব্ধ হউক। ১৯১৪ সালের যুদ্ধ চার বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল, ১৯৩৯ সালের যুদ্ধও ছয় বৎসর যাবৎ চলিল; অথচ উভয় পক্ষের চেষ্টার অন্ত ছিল না, প্রতিপক্ষের উপরে প্রচণ্ডতম আঘাত হানিয়া কত শীঘ্র যুদ্ধের অবসান ঘটানো যায়। সেইজন্য জার্মানির শহরগুলির উপরে বোমা নিক্ষেপের সময়ে জনৈক ইংরেজ ধর্মযাজক, সাধারণ নাগরিকের হত্যাকে অনিবার্য এবং যুদ্ধের আশু সমাপ্তির প্রয়োজনে অপরিহার্য জ্ঞান করিয়া সমর্থনই করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, যুদ্ধ এই উপায়ে শীঘ্র শেষ হইলে, চক্রশক্তিবৃন্দ পরাস্ত হইলে, জগতে লোকক্ষয় মোটের উপরে কম হইবে। সেই কারণেই চার্চিল সাহেব যখন জার্মান জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'We shall bleed and burn them to death', তখন শান্তিকামী, শিক্ষিত জনসাধারণ যুদ্ধের হত্যাকাণ্ডকে মানবের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য অনিবার্য ভাবিয়া চার্চিলের কথায় অন্তরে অন্তরে সায় দিয়াছিল।

মার্ক্সবাদীগণের কর্মধারা অনুধাবন করিলেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তাঁহারা মানবসমাজের কল্যাণকামী; জগতে শোষণের অবসান ঘটিয়া সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক ইহাই তাঁহাদের কাম্য। কিন্তু সেই শান্তি দ্রুত আনয়নের চেষ্টায় তাঁহারা যুদ্ধে নিরঙ্কুশ

নিষ্ঠুরতা সমর্থন করিয়া থাকেন। যেদিন বার্লিন শহর রুশ-সৈন্যের আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়, সেই দিবসকে তো তাঁহারা মানবজাতির মুক্তির এক সন্ধিক্ষণ বলিয়াই অভিনন্দিত করিয়াছেন।

মানবজাতির যুগযুগান্তব্যাপী শোষণের অবসানচেষ্টার অর্থ বোঝা যায়। তাহার জন্য অসহিষ্ণুতা একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সর্বত্র যুদ্ধের দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটাইবার জন্য যে ব্যস্ততা দেখা যায়, তাহার পিছনে আরও একটি ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে।

মানুষ যখন কোনও প্রয়োজনের বশে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন সেই সংহারলীলায় উভয়পক্ষের উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের স্বাভাবিক জীবন সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইয়া যায়। অথচ সামাজিক বিবাদ নিষ্পত্তির যদি অপর কোন উপায় জানা না থাকে, বাধ্য হইয়া উভয় পক্ষকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয়, তখন প্রত্যেকে চেষ্টা করে, কত দ্রুত এই অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, অথচ শত্রুর পরাভবের ফলে নিজের সুবিধামত এক নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো যায়। সেই আশাতেই মানুষ যুদ্ধে উত্তরোত্তর নিষ্ঠুর হইতেছে, এবং বিজ্ঞানের সকল সম্পদ সংহারলীলাকে প্রচণ্ডতম করিবার জন্য নিয়োজিত করিতেছে; শুধু এই আশায় যে, মারণাস্ত্র যত ব্যাপক ফলপ্রদ এবং অমোঘ হইবে, যুদ্ধের ব্যাপ্তিকালকেও তত সংক্ষিপ্ত করা সম্ভব হইবে।

কিন্তু গান্ধীজীর মতে উপরোক্ত পন্থায় জগতের সাধারণ মানুষ কোনদিনই মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মারণাস্ত্রের অধিকার এবং রক্ষ প্রয়োগের উপরেই যদি সামাজিক শক্তি নির্ভর করে, তবে সাধারণ নরনারীর পক্ষে সে পথে মুক্তিলাভ করা কি কোনদিন সম্ভব? দ্রুত বিজয়লাভের জন্য মানবসমাজে যে সকল অস্ত্র নির্মিত হইয়াছে, তাহার ফলে ক্ষমতা উত্তরোত্তর সাধারণ মানুষের অধিকার হইতে দূরে সরিয়া যায়, সে খেলায় কোটি কোটি মানুষ দাবার বোড়ে অপেক্ষা উন্নত স্থান কখনও লাভ করিতে পারে না। অতএব দ্রুতসিদ্ধির লোভ মানুষকে পরিহার করিতে হইবে। সংগ্রামের ধরনও এমন হওয়া আবশ্যক যাহা স্বাভাবিক জীবনের ব্যতিক্রম না হয়, কোটি কোটি জনসাধারণের জীবন যে উৎপাদন-ব্যবস্থার উপরে নির্ভর করে, তাহাকে যেন বিপর্যস্ত করিতে না পারে।

সেইজন্য গান্ধীজী যখন সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের কল্পনা করেন, তাহার পূর্বে উৎপাদন-প্রণালীর বিকেন্দ্রীসাধনের দ্বারা তিনি এমনই লোকায়ত্ত এক জীবনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, যাহার সহিত সত্যাগ্রহযুদ্ধের কোনও অসামঞ্জস্য নাই। সেই লোকায়ত্ত উৎপাদনব্যবস্থাকে সর্বাবস্থায় সক্রিয় রাখার চেষ্টা এবং ধনতন্ত্রের নাগপাশ হইতে সংগ্রামের দ্বারা মুক্ত হইবার চেষ্টা, ভিন্ন ব্যাপার নয়; উভয়েই এক। অর্থাৎ সত্যাগ্রহের মধ্যে আইন-অমান্য, এবং গঠনকর্মের দ্বারা জীবনে নববিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, দুইটিই একমুখী

হওয়ার ফলে অহিংস বিপ্লব কোন অবস্থাতেই স্বাভাবিক জীবনের ব্যতিক্রম হয় না। অতএব তাহার দ্রুতনিষ্পত্তিরও কোন প্রয়োজন থাকে না।

গঠনকর্ম এবং আইন-অমান্য বা শান্ত প্রতিরোধকে মুদ্রার এপিঠ ওপিঠের মত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সম্পর্কিত মনে করা যায়; দুইয়ের মধ্যে কোনও ব্যবধান পর্যন্ত নাই। দেশের কোটি কোটি জনসাধারণ যদি নবজীবন লাভের জন্য গঠনকর্ম আশ্রয় করে, তাহাকেই গান্ধীজী বর্তমান শোষণমূলক কলুষিত জীবনপদ্ধতির সঙ্গে শ্রেষ্ঠতম অসহযোগ বলিয়া বিবেচনা করিবেন। আর কোটি কোটি জনসাধারণের মধ্যে যদি গঠনকর্মের সম্পর্কে উৎসাহ উৎপন্ন করা না যায়, তাহারা যদি আলস্যে ডুবিয়া থাকে, তবে ক্ষণিকের উৎসাহে শুধু আইন-অমান্যের অস্ত্রাঘাতের দ্বারা ধনতন্ত্রের উচ্ছেদসাধনের চেষ্টাকে গান্ধীজী স্বরাজ লাভের উপায় বলিয়া কদাপি স্বীকার করিবেন না। গান্ধীজী আরও বলিয়াছেন যে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত দিয়া যেমন অন্নের গ্রাস মুখে তোলা যায় না, গঠনকর্ম ব্যতিরেকে আইন-অমান্যের দ্বারাও তেমনই স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টাকে অহিংস উপায়ে অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম অহিংস জীবনপদ্ধতির ব্যতিক্রম না হওয়ার সত্যাগ্রহীর পক্ষে ব্যস্ততার কোনও কারণ থাকে না; গঠনকর্মের পরিবর্তে আইন-অমান্যকে স্বরাজ লাভের জন্য মুখ্য সাধন বলিয়া বিবেচনা করারও কোন অর্থ হয় না। যথার্থ বিপ্লব গঠনকর্মের পথেই আসিবে, তাহার বাধা নিরাকরণের জন্য কেবল যতটুকু সংগ্রাম বা আইন-অমান্যের প্রয়োজন। আর যদি এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায়, তবে সত্যাগ্রহীর পক্ষে সমগ্র জীবনব্যাপী চেষ্টাই তো বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়, তাহার মধ্যে ব্যস্ততা ও অসহিষ্ণুতার কোন স্থানই থাকে না।

যুদ্ধ এবং সত্যাগ্রহের ভেদ : অহিংস সংগ্রাম বিলম্বিত হইবার অপর কারণ

পাঠক হয়তো বলিবেন, অহিংসার পথে দীর্ঘব্যাপী সাধনা যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন অন্য উপায়ের সন্ধানও তো করা যাইতে পারে। সাধারণ মানুষের বিপ্লবেচ্ছা কখনও বহুদিন ধরিয়া তীব্র আকার ধারণ করিয়া থাকে না। অতএব হিংসার অস্ত্র প্রয়োগ করিলে যদি দ্রুত কার্যসিদ্ধি হয়, তবে হিংসার অসুবিধাগুলি সাময়িকভাবে স্বীকার করিয়া লইতে দোষ কি? হিংসার আনুষঙ্গিক দোষগুলি যথাসম্ভব পরিহার করিবার চেষ্টাও তো করা যাইতে পারে।

কিন্তু হিংসার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর যেমন এক আপত্তি, ইহা ধ্বংসমূলক ও অস্বাভাবিক এবং দ্বিতীয় আপত্তি, ইহার ফলে ক্ষমতা জনসমূহের আয়ত্তে যায় না, তেমনই তৃতীয় একটি গুরুতর আপত্তির কথাও তিনি উত্থাপন করিয়াছেন, যাহা হইতে হিংসার অস্ত্রকে মুক্ত করিবার কোন উপায় আছে বলিয়া আদৌ মনে হয় না। সেইজন্য হিংসার অস্ত্রকে তিনি সর্বতোভাবে পরিহার্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

হিংসার অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া যখন আমরা শোষণমূলক উৎপাদন-ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করিতে চাই, দণ্ডের দ্বারা প্রতিবিপ্লবকে নির্মূল করিয়া নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করি, তখন বিরুদ্ধ শক্তি আমাদের আঘাতের ফলে উত্তরোত্তর প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে। বর্তমান শোষকশ্রেণীকে কোনদিনই সবংশে হত্যা করিয়া নির্মূল করা সম্ভব নয়; অতএব ভয়ের বশে তাহাদের প্রতিবিপ্লবী বুদ্ধিকে সঙ্কুচিত রাখাই আমাদের লক্ষ্য হয়; তাহারা যেন পুনরায় সংঘবদ্ধ হইতে না পারে, সেজন্য সতর্কভাবে বহুবিধ আয়োজন বজায় রাখিতে হয়।

কিন্তু বর্তমান শোষণব্যবস্থার জন্য শুধু শাসক-সম্প্রদায়কে দায়ী করা কি-ঠিক কাজ? তাহাদের সহিত শোষিত শ্রেণীও, স্বেচ্ছায় হউক অথবা অনিচ্ছায় হউক, সহযোগিতা করে বলিয়াই যে বর্তমান শোষণপদ্ধতি কায়েম হইয়া রহিয়াছে, এ বিষয়ে কি কোনও সন্দেহের কারণ আছে? সে সহযোগিতা দারিদ্র্যের বশে, ভয়ে বা লোভের বশে দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু তবু ধনতন্ত্রের স্থিতি যে ইহারই উপরে নির্ভর করিতেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্তমান শোষণযন্ত্রের অধিকারীগণ যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়াছে তাহারই প্রভাবে তাহাদের স্বার্থবোধ, ক্ষমতালিপ্সা এবং নিষ্ঠুরতা নিরঙ্কুশভাবে বৃদ্ধির সুযোগলাভ করিয়া অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে; সে পরিবেশ তো আমাদের তামসিকতার দ্বারাই রচিত হইয়াছে। অতএব আমরা যদি অন্তরের তামসিকতা হইতে মুক্ত হই, স্বীয় পরিশ্রম এবং লোভহীন, অনলস চেষ্টার দ্বারা নূতন উৎপাদন-প্রণালী ও নূতন সমাজব্যবস্থা গড়িতে পারি, পুরাতন শোষণব্যবস্থার সঙ্গে নির্ভয়ে সহযোগ ছিন্ন করি, তবে সেই নূতন মানসিক পরিবেশের প্রভাবে আজিকার শোষক-সম্প্রদায়ের অন্তরেও দ্রুত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইবে।

মার্ক্সীয় বিপ্লবপন্থায় শাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম পরিবর্তন ভয়ের বশে করার বিধি আছে। পরে যদি শোষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু লোক নূতন সমাজে মানাইয়া চলিতে চায়, তবে তাহাকে পূর্ণ সুযোগ দিবার কথা আছে। কিন্তু অহিংস-পন্থার বিশেষত্ব হইল ইহা শাসক এবং শোষককে ভয়ে পঙ্গু করিতে চায় না, অহিংস অসহযোগের দ্বারা তাহার হৃদয়ে মনুষ্যত্বের ভাবকে জাগ্রত করিতে চায় এবং নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সমাজ-সৃজনের ব্যাপারে তাহার পূর্ণ ও সানন্দ সহযোগিতালাভের আশা পোষণ করে। এমন কি পুরাতন উৎপাদন-ব্যবস্থা ভাঙিবার ব্যাপারে পর্যন্ত তাহাদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করে।

তথাকথিত শত্রুর অন্তরে উপযুক্ত পরিবর্তন-সাধনের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ-সংগ্রামকে বিলম্বিত করিতেও গান্ধীজীর কোন কুণ্ঠা নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'আপাতত সত্যাগ্রহের পথ দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা দ্রুত পথ আর নাই। কারণ এ পথে সাফল্যলাভের বিষয়ে কোনও সংশয় নাই; অপর সকল পথে কবে যে সাফল্যলাভ ঘটিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না।'

মৌলিক প্রশ্নের সম্বন্ধে আলোচনা

সহানুভূতিসম্পন্ন পাঠক হয়তো বলিতে পারেন, আচ্ছা, তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করিলাম, অহিংস-সংগ্রামের প্রয়োজনে বিকেন্দ্রীকরণ অত্যাবশ্যক। ভারতবর্ষে আজ হিংসাত্মক সংগ্রামের জন্য সংগঠন সম্ভব নয় বলিয়াই হউক, অথবা অহিংস-উপায়ের দ্বারা উৎকৃষ্টতর ফললাভের আশা আছে বলিয়াই হউক, আমরা আজ কংগ্রেস হইতে সাময়িক-ভাবে অহিংস-পন্থাকেই স্বরাজলাভের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু যখন ভারত স্বাধীন হইবে, তখন যুদ্ধের চাপে বিকেন্দ্রীকরণের যে ভারা বাঁধা হইয়াছে, বাড়ি তৈয়ারি শেষ হইলেও কি সেই ভারা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে? বস্তুত শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ মূলত এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এবার সেই প্রশ্নের সম্বন্ধে যথাসাধ্য উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

শুধু গান্ধীজীর মত নৈরাজ্যবাদী কেন, মার্ক্সবাদী সমাজ-বৈজ্ঞানিকমাত্রে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, রাষ্ট্রের মূল দণ্ডশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দণ্ডের দ্বারা মানুষকে চিরকাল পরিচালিত করা কাহারও কাম্য হইতে পারে না। মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ স্বাধীনতার সূর্যালোকেই সম্ভব, শাসনের অন্ধকার মেঘচ্ছায়ায় কখনও সম্ভব নয়। সেই-জন্য মানবসমাজের পূর্ণ কল্যাণ যাঁহাদের কাম্য তাঁহারা এমন এক অবস্থা আনয়নের চেষ্টা করেন, যেখানে দণ্ডমূলক ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠানের যথাসম্ভব সঙ্কোচসাধন করিয়া, স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সামাজিক জীবন পরিচালিত হইবে।

সেইরূপ অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্বে মার্ক্সীয় বিপ্লবচেষ্টায় একটি বিশেষ লক্ষ্য সাময়িক-ভাবে দেখা দেয়। বর্তমান কালে সমাজ-জীবনে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে যাহার ফলে স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি যে সকল ভাবের অঙ্কুর প্রত্যেক মানবশিশুর মধ্যে অল্পাধিক মাত্রায় বর্তমান, সেগুলি শ্রেণীবিশেষের মধ্যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধির সুযোগ পাইয়া এমন আকার ধারণ করে যে, সমগ্র মানবজাতির জীবনপথ তাহার দ্বারা বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব মার্ক্সীয় মতে প্রথম প্রয়োজন হইল, সমাজের দণ্ড বা রাষ্ট্রশক্তি করতলগত করিয়া শোষণমূলক সকল প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদসাধন করা এবং

প্রতিবিপ্লবের সকল সম্ভাবনাকে নির্মূল করা। তখনই শুধু শোষণবিহীন সমাজরচনার পথ নিরঙ্কুশ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য, বাহিরে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আক্রমণ ও ভিতরে প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনার মধ্যে, রাষ্ট্রের হাতে প্রজার জীবনের উপরে সর্বময় কর্তৃত্বের ভার তুলিয়া দেওয়া উচিত। তখন কি সমাজে, কি উৎপাদন-বৃত্তিতে, এমন কি হয়তো চিন্তার উপরেও নানাবিধ বাঁধন দিতে হয়। কিন্তু যখন বাহিরে ও ভিতরে দুর্যোগ কাটিয়া যায়, সকল দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সর্বত্র সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে, তখন আর দণ্ডমূলক রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকে না। ক্রমে ক্রমে তাহার কার্যভার দণ্ডের পরিবর্তে সম্মতিমূলক প্রতিষ্ঠানের উপরে অর্পিত হয়, রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ ক্ষয় সম্পন্ন হয়। কিন্তু যতদিন বিপদের সম্ভাবনা থাকে, ততদিন রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং সে রাষ্ট্র উৎপাদকশ্রেণীর স্বার্থপুষ্টির জন্য প্রজার জীবনের উপরে সর্বময় কর্তৃত্বের ভার লইতেও পশ্চাৎপদ হয় না।

গান্ধীজী কিন্তু রাষ্ট্রকে কোন সময়েই এরূপ সর্বময় কর্তৃত্ব দিবার পক্ষপাতী নহেন। জনসমূহের সত্যাগ্রহের ফলে ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয়, তখন ভিতরের ও বাহিরের বাধা অতিক্রম করিবার দায়িত্ব তিনি কেবল রাষ্ট্রের উপরেই অর্পণ করিতে চান না। বরং জাগ্রত জনসাধারণ স্বীয় গণতান্ত্রিক নানাবিধ প্রতিষ্ঠানকে সত্যাগ্রহশক্তির দ্বারা রক্ষা করুক, ইহাই তিনি বেশি করিয়া চাহিবেন।

পাঠক বলিবেন, স্বাধীন ভারতেও তবে কি রাষ্ট্রশক্তি যথাসম্ভব কম প্রয়োগ করা হইবে? অর্থাৎ যতদিন নূতন সমাজরচনার পথে বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা আছে, ততদিন অসহযোগের আয়োজন এবং বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাকেও চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে হইবে? তবে তো রোগের সমূল বিনাশের ফলে স্বাস্থ্যলাভের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। মানুষকে চিরদিনই কলকারখানা এবং শিল্পে বৈজ্ঞানিক উন্নতি পরিহার করিয়া স্বাধীনভাবে ছোট-ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামে বাস করিতে হইবে। এ উপায়ে, সুখের পরিবর্তে স্বাধীনতালাভ ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু মার্ক্সীয় কর্মপন্থায় একত্র সুখ এবং স্বাধীনতার যে সমাবেশের সম্ভাবনা আছে, গান্ধীজীর পন্থায় তাহা তো কখনও সম্ভব নহে।

উত্তরে বলিব, গান্ধীজীর পথেও তাহা অনেকদূর পর্যন্ত সম্ভব। কিন্তু কতদূর সম্ভব তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন আছে। গান্ধীজী মনে করেন, জনসাধারণ বিকেন্দ্রী-করণের দ্বারা যে লোকায়ত্ত উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবে তাহার এক উদ্দেশ্য হইবে, কোন অবস্থাতেই যেন তাহাদিগকে অন্নবস্ত্রের অভাবে ক্লেশ পাইতে না হয়। কোন লোভের বশেই যেন তাহারা জীবনের মরণকাঠি জীয়নকাঠি পরহস্তে তুলিয়া না দেয়। কিন্তু এরূপ উৎপাদন-ব্যবস্থার ফলে শক্তির অপচয় ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

শ্রম-লাঘবের উদ্দেশ্যে এবং সমাজের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ছোট ছোট কেন্দ্রগুলি প্রয়োজনানুসারে সমবেত হইয়া বড় কলকারখানাও চালাইতে পারে। সে কারখানাগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হইয়া বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হইবে। যদি স্বাধীন কেন্দ্রগুলির সমবায়মূলক বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানেও পরিণত হয়, তাহাতে গান্ধীজীর আপত্তি নাই। প্রতিষ্ঠানের অবয়ব ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, তাহাতে তিনি বিশেষ বিচলিত হন না; তাহার মূল দণ্ড অথবা স্বাধীন সম্মতির উপরে নির্ভর করে কি না ইহার উপরেই তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কেহ যদি বলেন, 'বেশ তো, দেশসুদ্ধ লোক যদি রাষ্ট্রেরই হাতে স্বেচ্ছায় সে ভার তুলিয়া দেয় তবে দোষ কি?' গান্ধীজী বলিবেন, 'দোষ কিছু নাই।' কিন্তু তখন আসলে রাষ্ট্র আর দণ্ডশক্তির আধার না হইয়া স্বেচ্ছায় গড়া প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইবে, তখন কি আর তাহাকে রাষ্ট্র নাম দেওয়া যায়?

অর্থাৎ স্বেচ্ছায় কেন্দ্রীকরণে গান্ধীজীর আপত্তি নাই, বাধ্যতামূলক, দণ্ডাধীন কেন্দ্রীকরণে তাঁহার আপত্তি। যদি আমরা এইটুকু মনে রাখি তবে বুঝিতে পারিব, ভবিষ্যৎ সমাজে উৎপাদন-ব্যবস্থাতেই হউক অথবা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ব্যবস্থাতেই হউক, কেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কম বেশি হইতে পারে। কেবল, মার্ক্সীয় কর্মধারায় দণ্ডশক্তিমূলক রাষ্ট্রের যে সর্বময় কর্তৃত্ব সাময়িক প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, গান্ধীজী কোন অবস্থাতেই সে-জাতীয় দণ্ডশক্তির কেন্দ্রীকরণে সম্মতি দিবেন না। বিপ্লবের পরে নহে, বিপ্লবের সম্পাদনকাল হইতেই তিনি লোকায়ত্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপরে মানুষের জীবন-পরিচালনার সমধিক ভার অর্পণ করিয়া রাষ্ট্রের বা দণ্ডশক্তির ক্ষয়সাধনের ব্যবস্থা করেন। এইখানেই মার্ক্স এবং গান্ধীর কর্মপন্থার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যবধান দেখা যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীকরণ শুধু বিপথগামী রাষ্ট্রের শাসন হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নয়, মানুষের পূর্ণতর বিকাশের জন্যও প্রয়োজন হইতে পারে। গান্ধীর সহিত নৈরাজ্যবাদী ক্রোপট্‌কিন বা থোরো ও টলষ্টয়ের এইখানেই মিল সর্বাপেক্ষা বেশি। তবে টলষ্টয় যেমন রাষ্ট্রকে আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না, গান্ধী ঠিক সেরূপ মত পোষণ করেন না। তিনি নিজেকে 'practical idealist' বা আদর্শবাদী হইলেও বাস্তবধর্মী বলিয়া বিবেচনা করেন। সেইজন্য তাঁহার প্রস্তাবিত সমাজে রাষ্ট্র বর্তমান থাকিলেও ভারকেন্দ্র নীচের দিকে প্রতিষ্ঠিত। থোরোর সহিত সহমত হইয়া সেইজন্য তিনি বলেন, 'সেই রাষ্ট্রই ভাল, যাহার শাসনের দায়িত্ব কম।' আমরা দেখিয়াছি, কেন্দ্রীকরণ আবশ্যক হইলে তিনি তাহা স্বাধীনভাবে প্রদত্ত সম্মতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। এবং সেই স্বাধীনতার

ভার অনির্বাণ রাখিবার জন্য অন্নবস্ত্র এবং জীবনের পরিচালনার অনেকখানি ভার তিনি বিকেন্দ্রীকৃত অসংখ্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপরে ন্যস্ত রাখিতে চান। অহিংস বিপ্লব যে নেতিমূলক নহে, তাহা মুখ্যত গঠনপদ্ধতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির উপরেই নির্ভর করে, এই মৌলিক তত্ত্বটি আবিষ্কার করিয়া গান্ধীজী অহিংসাকে ভাবরাজ্য হইতে নামাইয়া মাটির রাজ্যে, মানবসমাজের দৈনন্দিন জীবনে, ইহলোকের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য, তাহার আসন রচনা করিয়াছেন। ইহাই বর্তমান জগতে গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠতম দান।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, মনুষ্যত্ববিকাশের বহুবিধ সুযোগ ও সুবিধা দিবার জন্য না হয় গান্ধীজীর অহিংস সমাজ গড়িয়া তোলা হইল। কিন্তু ধনতন্ত্র বা হিংসায় পুষ্ট এবং নিপীড়নের প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন-গোষ্ঠীর আক্রমণের সম্মুখে কি এরূপ অহিংস খণ্ডীকৃত সমাজব্যবস্থা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? আত্মরক্ষার জন্য তো দণ্ডাধীন কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন আছে। গান্ধীজী ইহার উত্তরে পুনরায় বলিবেন, অহিংস-সমাজব্যবস্থাকে সর্ববিধ আক্রমণের বিরুদ্ধে অহিংসার দ্বারাই আত্মরক্ষা করিতে হইবে। মরণের বীর্যের দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না—এই আশঙ্কাতেই মানুষ নিজের মত আরও কয়েকজনের সহিত সম্মিলিত হইয়া শত্রুর নিপাতসাধনের দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। এই তামসিক বুদ্ধিকে আশ্রয় করে বলিয়াই মানবসমাজ আজ পর্যন্ত মুক্তির আশ্বাস পায় নাই। সেই তামসিকতার প্রভাবে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, দল বাঁধিয়া মানুষ স্বীয় ঐক্যকে বারংবার পরাস্ত করিয়াছে। ধনী-নির্ধন, এক দেশ- অন্য দেশ, স্ত্রী-পুরুষ, শত্রু-মিত্র প্রভৃতির মধ্যে অধিকারের তারতম্য স্থাপন করিয়া মানুষ স্বীয় বুদ্ধির দোষে, অর্থাৎ নিজের কর্মফলের দ্বারা, নিজের দেহকে খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়াছে। স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রামের মধ্যে তাহারই মত একজন মানুষকে শত্রু ভাবিয়া সংহারের চেষ্টা করিয়াছে।

এই অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে মানুষ নিজেই যে আজ মুক্তি চায় তাহার প্রমাণ, যুদ্ধকে সে যথাসম্ভব সংকীর্ণ করিতে চায়; যুদ্ধের সময়ে যে বিদ্বেষবিষ উদ্গারিত হয় তাহার ফলে মানুষের অন্তর ক্লিষ্ট হয় বলিয়াই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিলে, জয়ই হউক অথবা পরাজয়ই হউক, মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু অন্তরের ভয় যদি বিদূরিত হয়, আত্মবলে প্রতিষ্ঠার দ্বারা নিঃশঙ্কভাব লাভ করা যায়, তখন মানুষ সর্বমানবের একত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। তখন আর কাহারও বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকে না, কেন না বিরুদ্ধ তখন আর কেহ নাই। যে ব্যক্তি তামসিক বুদ্ধিবশত সেই একত্বকে খণ্ডিত করে, সত্যাগ্রহী তাহার হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্য শান্তপ্রতিরোধ করেন, নিপীড়নের বা শাসনের, অর্থাৎ ভেদের অস্ত্র কখনও ধারণ করেন না। ইহাই সত্যাগ্রহীর পক্ষে আত্মরক্ষার সর্বোত্তম উপায়; সে অবস্থায় মানবসমগ্রের সহিত তিনি একাত্ম হইয়াছেন। এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, সেরূপ সত্যাগ্রহীর

প্রভাবে একত্বের বুদ্ধি ক্রমশ মানবসমাজে বিকীর্ণ হইলে, মানুষ যথার্থ মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। একত্বের সত্যকে উপলব্ধি ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গান্ধীজী অহিংসাকে তপস্যা বা সাধনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

শেষ কথা

শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ স্বীয় প্রবন্ধে যে সকল প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন, অহিংস মতবাদের পক্ষ হইতে যথাসাধ্য তাহার মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুইটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন তিনি প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করিয়াছেন, সর্বশেষে তাহার সম্পর্কে কিছু বিচার অবশিষ্ট আছে।

আজ ভারতের জাতীয় সংগ্রামের প্রয়োজনে ধনীদিগকে মনে করিতে হইবে যে, তাহার নিকট যে ধন আছে তাহা বস্তুত জাতির সম্পত্তি এবং সেই বস্তু উপনিধি স্বরূপ সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য শুধু তাহার কাছে ন্যস্ত আছে। গান্ধীজী বারংবার ধনীকে এই আদর্শ স্বীকার করিবার জন্য মিনতি জানাইতেছেন। তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, শ্রমিককুল অহিংস-অসহযোগের দ্বারা ধনীকে উপনিধিত্বের আদর্শে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে, এবং সেই বিদ্যা বা সত্যাগ্রহের কৌশল নিপীড়িত জনসাধারণকে শেখানোই তাঁহার জীবনের ব্রত। ধনীকে ভয়ে পঙ্গু করিয়া নয়, শান্ত প্রতিরোধের দ্বারা তাহার শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া কল্যাণের পথে হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করাই নিপীড়িতের লক্ষ্য হইবে।

গান্ধীজীকে এক সময়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, যদি চেষ্টা সত্ত্বেও ধনী উপনিধিত্বের আদর্শ স্বীকার না করে, তখন কি তাহাকে উত্তরাধিকারীসূত্রে লব্ধ সম্পদ নিজের খেয়াল-মত অপব্যয় করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইবে; অথবা রাষ্ট্রীয় আইনের সহায়তায় সেই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে? গান্ধীজী উত্তরে বলেন, কল্পিত অবস্থায় রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দণ্ডশক্তি প্রয়োগ না করিয়া সম্পত্তি অধিকার করায় দোষ নাই। কিন্তু যদি লোকটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, অথবা শোষিতের অহিংস অসহযোগের প্রভাবে, উক্ত আদর্শ গ্রহণ করিত, তবে তিনি বেশি খুশি হইতেন।

এখন প্রশ্ন হইল, ধনী বা মালিক জনসমূহের কল্যাণার্থে উপনিধিবাদ স্বীকার না করিলে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগের দ্বারা তাহার সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার ব্যবস্থাই যদি থাকে, তবে গান্ধীজীর উপনিধিবাদের আদর্শকে শুধু ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সকল শ্রেণীকে সংগ্রহ করিবার কৌশলমাত্র মনে করা কি ভুল হইবে? ধনীকে আশ্বাস দিয়া তিনি কি শুধু সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধি করিতেছেন না?

গান্ধীজী কিন্তু আদৌ তাহা স্বীকার করেন না। তিনি আর্থিক-সমতাসম্পন্ন নূতন যে সমাজ রচনা করিতে চান, সেখানে সকলে স্বেচ্ছায় স্বীয় সম্পদ সর্বজনের কল্যাণে

নিয়োজিত করুক, ইহাই তাঁহার আদর্শ। আজ যদি সমাজের অব্যবস্থার ফলে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ উপকরণ কাহারও ব্যক্তিগত অধিকারে থাকে, এমন কি কাহারও যদি বিশেষ কোনও বিদ্যা থাকে, বা শিল্পে বা সমাজের লোকপরিচালনায় ব্যক্তিগত দক্ষতা থাকে, তবে প্রত্যেকে সেই গুণ বা ক্ষমতাকে সকলের প্রয়োজনে ব্যবহার করুক—ইহাই গান্ধীজী চান। প্রত্যেকের মনে করা উচিত, 'আমার যে সম্পদ আছে, তাহা ঘটনাচক্রে আমার নিকট উপনিধির মত সংগৃহীত হইয়াছে; ইহার আসল মালিক সমাজ; কেন না, বহুজনের ও দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফলেই ইহা বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, আমার ব্যক্তিগত দান সে তুলনায় যৎসামান্য। সে দানও আমি, সমাজের আশ্রয়ে বাঁচিয়া না থাকিলে, করিতে অসমর্থ হইতাম। অতএব বিদ্যাই হউক, দক্ষতাই হউক, অর্থসম্পদই হউক, সমাজের নিজস্ব কোন না কোন সম্পত্তি আমার নিকটে শুধু গচ্ছিত আছে। সেটিকে জনসাধারণের প্রয়োজনে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করিবার জন্য আমি দায়ী।' এই বোধের জাগরণই উপনিধিবাদের মর্মকথা। অতএব গান্ধীজীর আদর্শমত অহিংস সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার উপনিধিবাদের অবসান না ঘটিয়া বরং তাহা পূর্ণতর ও স্পষ্টতররূপে দেখা দিবে।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থাকিয়া যায়, সঞ্চিত অর্থ বা উৎপাদনের উপকরণাদির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব অবস্থাবিশেষে লোপ করায় যখন গান্ধীজীর সম্মতি আছে, তখন স্বেচ্ছাধীন উপনিধিবাদের কি আর কিছু অবশিষ্ট থাকে? ক্রমে ক্রমে তো সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তি সাধারণসম্পত্তিতে পরিণত হইবে।

ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজী সন্তানের দায়াধিকারে বিশ্বাস করেন না। পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অর্থসম্পত্তি ভোগের ব্যবস্থার ফলে সমাজ দুই দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়: যে সম্পদ আসলে সমাজের সম্পত্তি তাহা হইতে সমাজ বঞ্চিত হয়, উপরন্তু বাল্যকাল হইতে ভোগের মধ্যে লালিতপালিত হওয়ার ফলে ধনীসন্তানের মধ্যে যদি বিশেষ কোন গুণ বর্তমান থাকে তাহাও চর্চার অভাবে বিকাশ পায় না, অতএব সেই সম্পদ হইতেও সমাজ বঞ্চিত হয়।

তাহা সত্ত্বেও মানবপ্রকৃতির বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া গান্ধীজী বলেন, 'যদি কোন লোক যথার্থই উপনিধিবাদ স্বীকার করে, এবং সমাজকে সেই নিধির প্রকৃত মালিক বলিয়া মানে, তবে আমি তাহার পরিচালনাধীনে ধনসম্পদ ছাড়িয়া রাখিতে প্রস্তুত আছি। এমন কি তাহাকে বলিব, পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার পর তাহার কার্যকলাপ দেখিয়া তোমার যদি মনে হয়, সেও সমাজের কল্যাণে সেই ধন ব্যবহার করিবে, তবে তাহারই জিম্মায় ধনসম্পদ রাখিয়া যাইও। অন্যথা অর্থসম্পত্তি সাধারণ-ভাণ্ডারে পরিণত করিও।' অর্থাৎ, সমাজে যদি জাগ্রত জনশক্তি বর্তমান থাকে, তবে তাহার ছায়াতলে ভোগের নিমিত্ত ব্যক্তিবিশেষকে উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিবার স্বাধীনতা পর্যন্ত

দিতে গান্ধীজী স্বীকৃত আছেন। কিন্তু মানুষ সে অধিকার না চাহিয়া একান্তভাবে নিজের সকল গুণ এবং ক্ষমতা সমাজের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করুক, পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাহাকে সমগ্রের কল্যাণার্থে নিবেদন করুক, ব্যক্তিগত সম্পত্তি মিটিয়া যাক, ইহাই হইল গান্ধীজীর অপ্রতিগ্রহের চরম আদর্শ।

সাম্যবাদীগণও অপ্রতিগ্রহের আদর্শই প্রতিষ্ঠা করিতে চান। কেবল তাঁহাদের পথ স্বতন্ত্র। মানুষের বা ব্যক্তিবিশেষের উপর দায়িত্ব না রাখিয়া প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থান্তরের দ্বারা তাঁহারা সকলের কল্যাণের পরিবেশ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। তবে তাঁহারা যে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই, কেবল মানুষের উপরে তাঁহাদের ভরসা কম।

মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান, উভয়ের উপরে বিশ্বাস কমবেশি-মাত্রায় গান্ধীজী এবং সাম্যবাদীদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সেই মাত্রার তারতম্য এত অধিক যে, সাম্যবাদ হইতে গান্ধীজীর অহিংস মতবাদকে প্রায় একটি পৃথক মত বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির মারফত ভারতের আর্থিক জীবনের যে পরিকল্পনা দিয়াছেন, তাহা কি গান্ধী-প্রদর্শিত গঠনকর্ম অপেক্ষা উন্নত, সময়োপযোগী, স্বাধীন ভারতের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা নহে? আমরা কি সংস্কারের বশেই ভবিষ্যতের জন্যও বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছি না?

পণ্ডিত জওহরলাল ভারতবর্ষের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীনে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের সহিত দেশের বেকার-সমস্যাকে সর্বতোভাবে দূর করিবার জন্য কুটিরশিল্পেরও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু সে ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় যন্ত্রশিল্পের স্থান মুখ্য এবং কুটিরশিল্পের স্থান গৌণ। কুটিরশিল্প বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের পরিপূরকের স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই বলিলেই চলে। পণ্ডিতজীর বিশ্বাস, এবং বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকও বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, যদি বর্তমান জগতে ভারতবর্ষকে অপর স্বাধীন দেশের সঙ্গে সমান তালে চলিতে হয়, যদি এদেশে ভোগের মাত্রা যথেষ্ট উন্নত করিতে হয়, সর্বোপরি বর্তমানকালের সমরকৌশল আয়ত্ত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, তবে স্বাধীন ভারতে যথেষ্ট কেন্দ্রীকরণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িবে।

গান্ধীজী কিন্তু এই পদ্ধতিতে আদৌ আস্থাবান নহেন। সে ক্ষেত্রে জনসমূহের অধিকার হইতে আর্থিক জীবন ও তাহা রক্ষা করিবার ক্ষমতা অল্পসংখ্যক লোকের হাতে চলিয়া যাইবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। এ অবস্থাকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তিনি ইহাকে জনসাধারণের স্বরাজের আখ্যা দিতে অস্বীকার করিবেন।

তাঁহার পরিকল্পিত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে সুপরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিলেও, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারকেন্দ্র বিকেন্দ্রীকরণ ও সত্যাগ্রহ-কৌশলের কল্যাণে নীচের দিকেই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

শহরে কলের জল সরবরাহের জন্য যেমন প্রথমে এক স্থানে সমস্ত জল সংগ্রহ করিয়া তাহার পর প্রতি গৃহস্থের বাড়ি পর্যন্ত সেই জল কলের সাহায্যে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়, পণ্ডিতজীর পরিকল্পনা সেই প্রকারের। কিন্তু যদি মানুষের জীবনকে প্রকৃতির সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে সংযুক্ত রাখিয়া শহরের অস্বাভাবিক ঘনবসতি হইতে মুক্ত করিয়া নূতন ধরনের সুস্থ গ্রাম রচনা করা যায়, গান্ধীজীর পরিকল্পনা তাহার মত হইবে। সেখানে প্রতি গৃহস্থের বাড়িতে কূপ অথবা হয়তো পল্লীতে পল্লীতে জলাশয়ের ব্যবস্থা থাকিবে। জলের ব্যাপারে মানুষ স্বাবলম্বী হইবে। কিন্তু জল তো আবদ্ধ হওয়ার ফলে দূষিতও হইতে পারে। সেই সঙ্কীর্ণতাপ্রসূত দোষ দূর করার জন্য নিকটে নদী থাকিলে, এক গ্রামের লোক অপর গ্রামের লোকের সহিত সহযোগিতা করিবে, এক দেশের লোক অপর দেশের লোকের সহিত প্রয়োজনানুসারে সংঘবদ্ধ হইবে, এবং নদীর জলকে নিয়ন্ত্রিত, শাসিত অথবা খালের পথে পরিচালিত করিয়া মাঠের উর্বরাশক্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিবে, পুষ্করিণীকে নূতন বর্ষার জলে ভরিয়া মাছে পূর্ণ করিবার, গ্রামকে পরিচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। এইরূপে সমবেত সংঘশক্তির দ্বারা মানুষ জীবনের মানকে ও ভোগের মাত্রাকে আবশ্যকমত উন্নততর ও পূর্ণতর করিবার চেষ্টা করিবে।

পণ্ডিতজী এবং গান্ধীজীর পরিকল্পনার মধ্যে, জল সরবরাহের জন্য উপরে যে দুই ব্যবস্থার বর্ণনা করা হইল, তাহার মধ্যে যে প্রভেদ আছে, সেইরূপ প্রভেদ বর্তমান। একটিতে শক্তির ভারকেন্দ্র রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যস্ত; অপরটিতে প্রয়োজনানুসারে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলেও সর্ববিধ শক্তির ভারকেন্দ্র সমাজের নীচের দিকেই প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা হয়। উভয় পরিকল্পনার মধ্যে প্রভেদ এত বেশি যে উহাদিগকে ভিন্নধর্মী বলিয়া স্বীকার করাই ভাল।

ইহার মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত ভাল কোন্‌টি মন্দ তাহা বিচার করিবার অভিপ্রায় আমার নাই। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ যদি স্পষ্ট হইয়া থাকে, তবেই আমি নিজের শ্রমকে সার্থক বলিয়া বিবেচনা করিব।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

৯ই আগস্ট

চৈতন্য লভিয়া জড় শুরু কৈল মুক্তির সংগ্রাম,
ভারতের চিত্ত জুড়ে ন'য়ে গেল একটি প্রণাম।

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

শীতের প্রত্যূষে ঘুমটি যখন বেশ জমেছে, ঠিক সেই সময় দিদিমণি আমাদের ঘরে এসে চেঁচামেচি ক'রে আমাদের তুলে বললে, চল, বাবুজীর সঙ্গে দেখা করবে না ?

তখনও ফরসা হয় নি, কিন্তু দেখলুম, তার স্নান হয়ে গিয়েছে। মাথার ওপরে তেমনই চূড়ো ক'রে চুলের রাশি, গায়ে শুধু একখানা দামী শাল জড়ানো।

দিদিমণির সঙ্গে গিয়ে আমরা ঢুকলুম সেই ঘরে—কাল বিকেলবেলা যেখানে তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলুম, পেণ্ট্‌লান ও হাঁটু অবধি ঝোলা গরম-কোট-পরা একটি ভদ্রলোক খাটের ওপরে ব'সে রয়েছেন। রোগা, লম্বা, মাথার চুল অধিকাংশই কাঁচা, তবু দেখলে মনে হয়, বেশ বয়স হয়েছে। তাঁর পাশে একটা নীচু জলচৌকির ওপর একটা কাঁসার ঘটি বসানো, শঙ্কর চাকর পায়ের জুতোর ফিতে বেঁধে দিচ্ছে।

আমরা ঘরে ঢুকেই তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। আমার মেয়ে মনোরমা কাল রাতে তোমাদের সব কথা আমায় বলেছে। তোমরা এসেছ, ভালই হয়েছে। এখানে থাক, মন-টন খারাপ লাগলে বাড়ি চ'লে যেও, সেখানে কিছুদিন থেকে আবার চ'লে আসবে।

দিদিমণি তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, ওরা আর বাড়ি যাবে না বলেছে।

জলচৌকির ওপর থেকে ঘটিটা তুলে নিয়ে আলগোছে প্রায় সের দেড়েক দুধ ঢক্‌ঢক ক'রে উদরস্থ ক'রে তিনি বললেন, মা বাপ রয়েছেন, মধ্যে মধ্যে বাড়ি যাবে বইকি ! ছেলেমানুষ, মন খারাপ করবে না ?

দিদিমণি আমার দিকে এগিয়ে এসে বললে, কি মন খারাপ হবে নাকি ?

যেন সমস্যাটার সমাধান বাপের সামনে এখুনি হয়ে যাক।

আমি বললুম, না, মন খারাপ কেন হবে ?

দিদিমণি বাপের দিকে চেয়ে বললে, ওই শোন, কিছু মন খারাপ হবে না। কেন মন খারাপ হবে, এও তো নিজের বাড়ি—কি বল ভাই ?

বৃদ্ধ পিতা এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে খানিকটা প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন, কানের অসুখ কার ?

দিদিমণি পরিতোষকে দেখিয়ে দিতে তিনি তাকে আলোর কাছে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে কান টেনে-টেনে ভেতরে পরীক্ষা ক'রে বললেন, ও কিছু না, আমি আসবার সময় ওষুধ নিয়ে আসব।

বাবুজী চ'লে গেলেন। দিদিমণি বললে, চল্, তোদের ঘরে যাই।

ঘরে এসে একখানা লেপ তিনজনে পায়ের ওপর চাপা দিয়ে বসলুম। দিদিমণি বলতে লাগল, তোরা এসেছিস এবার একটু গল্প ক'রে বাঁচব। সুদন চ'লে গেছে সে আজ পনেরো-বিশ দিন হয়ে গেল, সেই থেকে বাবুজী ছাড়া আর বাংলায় কথা কইবার লোক পাই নে।

বাবুজীর কথা উঠল। দিদিমণি বললে, আমার বাবুজীও সত্যযুগের লোক, ওরকম লোক হয় না। কি মজলিসী লোকই ছিলেন, আমার মাতাজী মারা যাবার পর থেকে ওই এক রকম হয়ে গেছেন, আর কারুর সঙ্গেই মেলামেশা করেন না। নির্জনে বাস করবার জন্যে এখানে এই বাড়ি কিনেছেন। তা ওঁর বাড়ি কেনাই সার হয়েছে। সপ্তাহের ছ-দিন তো একরকম কাশীতেই কাটে, রবিবার দিনটা শুধু বাড়িতে থাকেন। বাবুজীর আসকারা পেয়েই তো আমার বড় ভাইটা নষ্ট হয়ে গেল। মাতাজী ওকে দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। আমার মাতাজী দেবী ছিলেন। তিনি চ'লে যেতেই তো সংসারটা ছন্নছাড়া হয়ে গেল।

দিদিমণির গলা ধ'রে গেল। আর কিছু না ব'লে সে চুপ করলে।

জিজ্ঞাসা করলুম, এই শীতে এত ভোরে আপনি স্নান করেন কি ক'রে ?

দিদিমণি হেসে বললে, এখন কি রে ! স্নান করেছি সেই কখন ! আমি উঠি ঠিক চারটেয়। উঠে গরুর জন্য যে চাকর আছে তাদের তুলে দিই গাইয়ের জাব দেবার জন্যে। তারপরে ঘণ্টাখানেক ধ'রে তেল মাখি। স্নান সেরে এসে বাবুজীকে তুলে দিই, তিনি স্নান করতে যান। ওদিকে শুতে শুতে প্রায় রাত্রি বারোটা বেজে যায়। রাত্তিরে এই তিন-চার ঘণ্টার বেশি ঘুমের আমার দরকার হয় না। শুধু দুপুরবেলা ঘণ্টা-দুয়েকের জন্যে শুই, তার মধ্যে এক ঘণ্টা পড়ি, আর এক ঘণ্টা ঘুমুই। দিনের বেলা বেশি ঘুমুলে—বাবা,

মোটা হয়ে যাব, এমনিতেই তো হাতী হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। এবার খাওয়া কমাতে হবে।

আমাদের কথাবার্তা হতে হতে চারিদিক ফরসা হয়ে গেল। বাড়িঘর ঝাঁট দেওয়া ও চাকর-বাকরদের আওয়াজ আসতে লাগল চারিদিক থেকে। দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলে, চা খাবি ?

চার কথা শুনে আনন্দে মন নেচে উঠল। বললুম, চার ব্যবস্থা আছে নাকি ?

দিদিমণি উৎসাহিত হয়ে বললে, আরে, চায়ের আমার ভারি শখ। ছোট্‌কা আর আমি ছাড়া বাড়ির আর কেউ চা খায় না, তা আজকাল ছোট্‌কা চা ছেড়ে দিয়েছে ব'লে নিজের জন্যে আর তৈরি করি না। খাবি ?

বললুম, আমাদের তো জন্মাবধিই চা খাওয়ার অভ্যেস, কিন্তু বাড়ি থেকে পালিয়ে অবধি অভ্যেস ছুটে গিয়েছে, কোথায় পাব চা বিদেশ বিভূঁয়ে !

দিদিমণি মুখে একবার চক্‌চক্ আওয়াজ ক'রে বললে, বেচারা !

তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোরা ব'স্, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দিদিমণি চ'লে গেল। আমরা মুখ-টুখ ধুয়ে চায়ের প্রত্যাশায় ব'সে রইলুম, কিন্তু চা আর আসে না। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পর একজন চাকর একথালা গরম জিলিপি আর দু গেলাস গরম দুধ নিয়ে এসে হাজির হ'ল। চা আর বরাতে হ'ল না মনে ক'রে সেইগুলিরই সদ্ব্যবহার ক'রে বিড়ি ফুঁকতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না, একটু পরেই দু বাটি চা এসে হাজির হ'ল। চা-পানান্তে বিশুদার আড্ডায় গিয়ে বসলুম। সেখানে গিয়ে দেখি, সেই ভোরেই দু-পাঁচজন লোক এসে হাজির হয়েছেন। বিশুদা তার সেলাইয়ের তল্পি কোলে নিয়ে সেইরকম পা ছড়িয়ে ব'সে তাদের সঙ্গে গল্প করছে।

ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই যে বাংলা দেশ—অতি বিচিত্র দেশ এ, বিচিত্রতর এখানকার অধিবাসীদের হালচাল। ভারতের পুরাতন ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় যে, সেকালে এদেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত। বাংলা দেশের বাইরের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ব'লে থাকেন, এ দেশ পাণ্ডববর্জিত, অর্থাৎ পাণ্ডবেরা নাকি এ দেশে কখনও আসেন নি। অবশ্য পাণ্ডবদের মতন অসভ্যরা যদি

এদেশে না এসে থাকেন, তাতে আমাদের কোনও ক্ষতিই হয় নি। যে দেশে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর মুখ দেখলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত, সেখানে ভাদ্দরবউকে নিয়ে পাড়া জানিয়ে ঘরে খিল লাগানোর প্রতিক্রিয়া যে কি হ'ত, তা ভাবলে আর জ্ঞান থাকে না—কারণ পাণ্ডবদের ধর্মবন্ধু, মতান্তরে ধর্মপিতা, কৃষ্ণচন্দ্রের লীলাখেলাকে ধর্মসাধনের অঙ্গ ক'রে অধ্যাত্মজগতের পাকা সড়ক দিয়ে যেভাবে আমরা তেড়ে উন্নতির মার্গে আরোহণ ক'রে চলেছিলুম, অত্যাচারী ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বাধা না দিলে বৃন্দাবনের স্থান নির্ণয় করতে হয়তো আজ ঐতিহাসিকেরা হিমসিম খেয়ে যেতেন। তাই বলছিলুম, পাণ্ডববর্জিত যদি হয়ে থাকি, তাতে আমাদের কোন দুঃখই নেই, দুঃখ এই যে, এ দেশ ঈশ্বরবর্জিত।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে পূর্ব সমুদ্রের কোলে এই যে বাংলা দেশ—এ দেশের অর্ধেক জল ও তার অর্ধেক জঙ্গল। এরই মধ্যে এখানে ওখানে যেটুকু ডাঙা জমি আছে, সেইটুকুই আমাদের চাষ ও বাসভূমি। প্রকৃতির লীলানিকেতন এই দেশ—পৃথিবীর আর কোনও দেশে ষড়ঋতুর আবির্ভাব হয় না ; কিন্তু তথাপি অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও মহামারী—একটা না একটার উৎপাতে বঙ্গবাসী আবহমানকাল থেকেই পুলকিত হয়ে আসছে। এ ছাড়া সর্পভীতি ও অন্য জানোয়ারের ভয় তো আছেই। সবার ওপরে বিদেশীরাজ-স্নেহাতিশয্যের প্ররোচনায়-পালিত প্রতিবেশী কর্তৃক স্ত্রী-কন্যাপহরণের অত্যাচার—সে তো প্রায় গা-সওয়াই হয়ে গেছে।

এই দেশ—যেখানকার ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত মৎস্যমাংসভুক্, সেই দেশকে সারা আর্যাবর্ত ঘৃণা করলেও কোনদিনই তারা একে অবহেলা করতে পারে নি। তার কারণ আর্যাবর্তবাসীর ঔদার্য নয়, তার কারণ বাঙালীর পৌরুষ ও শক্তিমত্তা।

এই ঈশ্বরবর্জিত দেশ থেকে যুগে যুগে আচার্যেরা গিয়েছেন আর্যাবর্তের দিকে দিকে শিক্ষাদানের জন্য। দর্শন-বিজ্ঞান, কাব্য-ন্যায়ের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভায় এ দেশ চির-প্রদীপ্ত।

ইংলণ্ডীয় ক্রীশ্চানেরা এখানে আসবার অনেক আগে থেকে এখানকার অধিবাসীরা আর্যাবর্তের স্থানে স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে কার্যব্যপদেশে। তারা যেখানেই গিয়েছে, সেই দেশকেই আপনার ক'রে নিয়েছে। শিক্ষায়, সেবায়

ও সমাজসংস্কারে তারা নিজেদের ব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছে সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে—যুগে যুগে তারা সেখানকার অধিবাসীদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

কিন্তু পরবাসী হ'লেও মাতৃভূমির সঙ্গে নাড়ীর যোগ তাদের কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি। মাতৃভূমির কোনও লোক, তা সে ভ্রমণব্যপদেশেই হোক বা দুর্দশায় প'ড়েই হোক, তাদের আশ্রয়প্রার্থী হ'লে, সে ব্যক্তি যে শ্রেণীর লোকই হোক না কেন, যথাসাধ্য তার সাহায্য করেছে, নিজের পরিবারের মধ্যে তাকে আপনার ক'রে নিয়েছে। বাইরে এদের হালচাল যাই হোক না কেন, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য, বাংলা ভাষা, বাঙালীর পোশাক ও বাঙালীর খাদ্য তারা ত্যাগ করে নি।

এই রকম এক বাঙালী পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের বর্তমান আশ্রয়দাতা, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব এই দুই প্রদেশের সীমান্তে কোন এক শহরে। লাহোরের মেডিক্যাল ইস্কুল থেকে পাস ক'রে কিছুকাল সৈন্যদলে কাজ ক'রে সিভিল চাকরিতে বদলি হয়ে সম্মানের সঙ্গে চাকরি শেষ ক'রে তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন। বিবাহ করেছিলেন বাংলা দেশেরই এক পল্লীগ্রামের মেয়েকে। দশ বছরের মেয়ে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে চ'লে এসেছিল এই দূর বিদেশে। তারপরে বোধ হয় বার দুই-তিন বাপের বাড়ি আসবার সুবিধা হয়েছিল, তার পরেই স্বামীর ঘর নিজের ঘর হয়ে গেল। অদ্ভুত বাঙালীর মেয়ে, জগতে তাদের তুলনা নেই।

ওপরে যাদের কথা উল্লেখ করলুম, তারা ছাড়াও আর এক শ্রেণীর বাঙালী আর্যাবর্তের স্থানে স্থানে ছড়িয়ে আছে, মাতৃভূমির সঙ্গে যোগসূত্র তাদের ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এরা বাংলা ভাষা, বাঙালীর বেশ ও খাদ্য ভুলে গিয়েছে, কিন্তু বাঙালীর সঙ্গে নাড়ীর টান এখনও ছিন্ন হয় নি। তাই বাঙালী কারুকে দেখতে পেলে অতি বিনীতভাবে নমস্কার ক'রে সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, ম্যয় বাংগালী হুঁ। এঁরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, অমুক ভটাচারী কিংবা অমুক ঘাংগোলি। এঁদের পূর্বপুরুষেরা বিদেশে গিয়েছিলেন কোনও মন্দিরের পৌরোহিত্য, কোনও রাজকার্য কিংবা সেনানীর চাকরি নিয়ে, ব্যবসা-সূত্রেও কেউ কেউ গিয়েছিলেন। পুরুতের কাজ নিয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের বংশধরেরা এখনও পৌরোহিত্যই করছেন। যাঁরা অন্য কাজে গিয়েছিলেন,

তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়েছেন জমিদার, কেউ কেউ বা রাজসরকার থেকে জায়গীর পেয়ে হয়েছেন সর্দার। এদের ছেলেদের বিয়ে হয় অতি মুশকিলে। পরিবারের মধ্যে চারটি ছেলে থাকলে দুটির বিয়ে হয়, আর দুটিকে অবিবাহিতই থাকতে হয়। প্রত্যেক ছেলের বিয়ের সময়েই এরা প্রথমে খাস বাঙালীর ঘরের মেয়ে খোঁজে। তারপরে খোঁজে যুক্তপ্রদেশের আধা-বাঙালীদের ঘরে। সেখানেও না পেলে শেষে নিজেদের মধ্যেই, কিন্তু সগোত্রে নয়, বিয়ে দেয়।

এই রকম ঘরের একটি ছেলের সঙ্গে একবার আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে বেচারা বিয়ে করেছিল কাশীতে। স্ত্রীকে সে ভালবাসত বললে ঠিক বলা হয় না, তাকে সে দেবীর মতন পুজো করত। দু-পাঁচ বছর অন্তর স্ত্রী বাপের বাড়ি যেত, সেখান থেকে সে বাংলায় চিঠি লিখত স্বামীকে। আমার বন্ধু সেই চিঠি বগলে নিয়ে দশ মাইল দূরে এক আধা-বাঙালীর কাছে যেত চিঠি পড়াবার জন্যে আর তাকে দিয়েই সেই চিঠির জবাব লিখিয়ে ডাকঘরে ফেলে দিয়ে বাড়ি আসত। এদের বাড়িতে বার কয়েক নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছি। প্রথমবারে মেয়েরা কেউ সামনে বেরোয় নি। তার পরে ছেলেমানুষ দেখে মা-খুড়ীর দল বেরুলেন, ইয়া ইয়া পেশোয়াজের মতন ঘেরওয়ালা সব 'লাহেঙ্গ' পরা, কেউ বা যোধপুরের মেয়ে কেউ বা বিকানীরের। নতুন বউয়ের দেখাদেখি অল্পবয়সীরা শাড়ি পরতে আরম্ভ করেছে, তাই নিয়ে সংসারে অশান্তির সীমা নেই।

এই রকম একটি পরিবার, যাদের পূর্বপুরুষ রাজকার্য-ব্যপদেশে কোনও এককালে রাজপুতানার পাহাড়-ঘেরা কোলে এক রাজ্যে গিয়েছিল বসবাস করতে। নিজেদের শৌর্য ও কর্মকুশলতায় তারা সেখানকার প্রথম শ্রেণীর সর্দারের পদে উন্নীত হয়েছিল। রাজ্য ছোট হ'লেও তাদের জমিদারি ছিল বিপুল। পাহাড়ের ওপরে প্রাসাদ, বাড়িতে চার-পাঁচশো লোক, এই পরিবারের বড় ছেলের সঙ্গে দিদিমণির বিয়ে হয়েছিল। সেখানকার মহারাজা নিজে উদ্যোগী হয়ে এই বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন। দিদিমণির মা বাবা মনে করলেন, তাঁদের মেয়ের যেমন রাজরাণীর মতন রূপ ও হালচাল, তেমনই ঘরে ভগবান তার বরও জুটিয়ে দিলেন। কিন্তু ভবিতব্য ছিল অন্য, কারণ, শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রথমবার ফিরে এসেই দিদিমণি প্রকাশ করলে যে, তার স্বামী আধপাগলা। তবে অত্যাচার কিছু করে না, শুধু সারারাত তার পা-দুটো জড়িয়ে ধ'রে শুয়ে থাকে।

কিন্তু এরকমও বেশি দিন চলল না। বিয়ে ক'রে ভাল ভাল মাথাওয়ালা লোকেরই মেজাজ বিগড়ে যায়, আধপাগলা তো দূরের কথা!

একদিন এই আধপাগলা ফুর্তির চোটে মারলে লাফ পাহাড়ের ওপর থেকে গভীর খাদে, দিদিমণি মাথার সিঁদুর মুছে ফিরে এল বাপের বাড়ি।

তারপরে চলল লড়াই বিষয়-আশয় নিয়ে। শেষকালে মহারাজা মাঝখানে প'ড়ে প্রায় লাখখানেক টাকা দিয়ে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন। দিদিমণির নামে টাকাটা তার বাবা আগ্রার বাঙাল ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দিলেন। গয়না ইত্যাদি স্ত্রীধন সব বাড়ির সিন্দুকে উঠল। চেক কাটবার জন্যে সে ইংরিজী শিখতে লাগল, আমরা দেখেছি তার হাতের লেখা মুক্তোর মতন। সেই থেকে সে বাপের বাড়িতেই আছে।

মা মারা যাওয়ার পর বাপের বাড়ির সারা সংসারের ভার স্বেচ্ছায় তুলে নিলে সে নিজের মাথার ওপর। সেই ভোর চারটের সময় উঠে গরুর চাকরদের তুলে দেওয়া। তারপরে স্নান সেরে দুধ গরম ক'রে বাপকে খাইয়ে তাঁকে কাশী পাঠিয়ে দেওয়া। প্রায় পনেরোটি ঝি-চাকরকে খাইয়ে বেলা একটার সময় আহারাদি শেষ ক'রে সে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। বছর পাঁচেক আগে বিছানার চাদরের মতন লম্বা-চওড়া একখানা 'হিতবাদী' ও একখানা 'বসুমতী' সাপ্তাহিক তার বাবা কাশী থেকে কিনে এনেছিলেন, তারই একখানা নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। প্রতিদিন এই কাগজের সম্পাদকীয় থেকে আরম্ভ ক'রে বিজ্ঞাপন পর্যন্ত প'ড়ে ঘণ্টাখানেকের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ে। কাগজ দুখানায় যত বই, ওষুধ ও দৈব-মাদুলীর বিজ্ঞাপন আছে, দিদিমণি তা সব ভি.পি.তে নিয়ে এসে ঘরে জমা ক'রে রেখেছে। ঘুম থেকে উঠে আবার সংসারের কাজে লেগে যাওয়া, ঘড়ি ধ'রে রুগ্ন ভাইয়ের ওষুধ ও পথ্য পাঠানো—এ সব ছাড়া কাশীর দাওয়াখানার হিসাব তো আছেই। গরুদের শিঙে ও ক্ষুরে একদিন যদি চাকরেরা তেল মাখাতে ভুলে যায় তো হুলুস্থুল বাধে বাড়িতে, সমস্ত সংসার ঘড়ির কাঁটার মতন চলেছে, একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই।

দিদিমণির বাবা, বয়স তাঁর প্রায় পঁচাত্তর। জীবনব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার দিন তাঁর ঘনিয়ে এসেছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সব ছেড়ে-ছুড়ে যে-কটা দিন বাঁচেন, নির্জনবাস করবার জন্যে এখানে বাড়ি কিনেছিলেন; কিন্তু কিছুদিন

চুপচাপ ব'সে থাকবার পর আবার কর্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। একদিন তাঁর সংসার ছিল বৃহৎ। নিজের অনেক ছেলেপিলে ছিল, তা ছাড়া বাইরের কত ছেলে কত আত্মীয়স্বজন তাঁর বাড়িতে মানুষ হ'ত। জমজমে সংসার, সবার ওপরে ছিল লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রী, কিন্তু মৃত্যু এসে একে একে প্রায় সকলকেই নিয়ে গেছে। একদিন তাঁর একলার আয়ে সংসারের খরচ কুলোত না, আজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থানুকূল্যে ভাগ্যবিধাতা তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে দিচ্ছেন, কিন্তু লোক নেই, কে ভোগ করবে, তাই মাসে মাসে উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা হচ্ছে। একটা মেয়ে, সেও বিধবা। দুটো ছেলের একটা কবে যায় তার ঠিক নেই, আর একটা হতচ্ছাড়া। কিন্তু কোনও কিছুতেই তাঁর আয়োজনও নেই বিসর্জনও নেই। তাঁর দিন যে ঘনিয়ে এসেছে সে কথা তিনি জানেন, কিন্তু মৃত্যুর পর মেয়ের যে কি হবে সে বিষয়ে কোনও চিন্তাই তাঁর নেই।

দিদিমণির ছোট ভাই, তার কথা আগেই বলেছি।

আমাদের দিনগুলি কাটতে লাগল পরম আনন্দে। পরিতোষের সঙ্গে বিশুদার ভারি ভাব জ'মে গেল, সে প্রায় সারাদিনই তার সঙ্গে কাটায়। দিদিমণি আমাকে দিয়ে তার নিজের টাকার হিসাব, সংসারখরচের হিসাব-পত্র লেখাতে আরম্ভ করলে। সকালবেলাটা আমার এই করতেই কেটে যায়। বাবুজী প্রতিরাত্রেই দাওয়াখানার একটা হিসাব নিয়ে আসতেন আর সকালবেলায় প্রতিদিন সেই হিসাব একটা পাকা খাতায় আমাকে টুকে রাখতে হ'ত। দিদিমণি বলতে লাগল, তুই আসায় যে আমার কি সুবিধে হয়েছে, তা কি বলব!

কিছুদিন যেতে না যেতেই পরিতোষ বিশুদার, আর আমি দিদিমণির লোক হয়ে গেলুম। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে দিদিমণি যখন গড়ায়, তখন তার কাছে ব'সে মাথার পাকাচুল খুঁজতে হয়। কোন দিনই পাকাচুল পাওয়া যায় না; সে বলে, অনেক আছে, তুই দেখতে পাস না। শেষকালে চুল চিরে চিরে তার মধ্যে আঙুল চালিয়ে মাথায় সুড়সুড়ি দিতে হয়। সে ঘুমিয়ে পড়লেই একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়ি। কোন কোন দিন দিদিমণি গল্প করে, তাদের সংসারের, তার শ্বশুরবাড়ির গল্প। তার বড় ভয়, ছোট্‌কা ম'রে গেলে, বাবুজী চ'লে গেলে তার কি হবে?

আমি বলি, আমরা রয়েছি, তোমার ভাবনা কি দিদি ?

দিদিমণি উঠে ব'সে থুতনিতে হাত দিয়ে সজলকণ্ঠে বলে, সত্যি বলছিস ?

সত্যি বলছি।

দিদিমণি আমার চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

একদিন আমি তাকে বললুম, বাবুজী ও বিশুদা যদি সত্যিই চ'লে যায়, তা হ'লে আমরা দেশেভ্রমণে বেরিয়ে যাব। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লে আবার কিছুদিনের জন্যে এখানে ফিরে আসব, আবার বেরিয়ে পড়ব।

আমার প্রস্তাবটা তার খুবই ভাল লাগল। সেই থেকে প্রায় প্রতিদিনই দেশভ্রমণের কথা শুরু হ'ল। দুপুরবেলা তার পাশে ব'সে ব'সে কখনও চ'লে যাই পৃথিবীর প্রান্তে সেই মেরুজ্যোতির দেশে, কখনও বা ঘুরে বেড়াই হিমালয়ের শিখরে শিখরে, কখনও বা সুইট্‌জারল্যাণ্ডের হ্রদে ষ্টীমবোটে চড়ি, কখনও বা কন্যাকুমারীর মন্দিরে ব'সে থাকি। সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, সেদিন আর বই পড়া হয় না।

এক অস্থির ছাড়া বাড়ির কথা মনেই হয় না, একা দিদিমণি আমার মা বোন দিদি সবার স্থান অধিকার ক'রে বসল।

মধ্যে মধ্যে মনে হয়, দেশভ্রমণের সময় মাকেও নিয়ে আসব। একদিন দিদিমণির কাছে সে-কথা বলামাত্র আনন্দে লাফিয়ে উঠে সে বললে, এখন কোনরকমে তাঁকে নিয়ে আসতে পারিস না ?

বললুম, মাকে আনতে গেলে আমায় তারা ধ'রে ফেলবে, আর আসতেই দেবে না।

নিরুৎসাহ হয়ে সে বললে, আচ্ছা, এখন তা হ'লে থাক্।

এবার এদের বড় ভাইয়ের কথা বলি। এ-বাড়িতে ঢুকে অবধি শুনে আসছিলুম যে, সে লোকটা মাতাল, লম্পট, জুয়াড়ী, বাড়ির সুখদুঃখের সঙ্গে তার কোনও সহানুভূতিই নেই। শুধু বাপের ভালমানুষির সুযোগে সে দু-হাতে সংসারের টাকা শুষছে আর ওড়াচ্ছে। এই সব শুনে তার প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব মনের মধ্যে জমা হয়েই ছিল। দুই বন্ধুতে তার সম্বন্ধে অনেক আলোচনাও হ'ত এবং এ কথাও আমরা বলাবলি করেছি যে, আমাদের মতন ভাইয়ের পাল্লায় পড়লে দু-দিনে চাঁদকে ঠাণ্ডা ক'রে দিতুম।

দিদিমণিদের বাড়িতে আসার বোধ হয় সাত-আট দিন বাদে একদিন রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় সেই চাঁদের উদয় হ'ল আমাদের ঘরে।

দিদিমণি আমাদের বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছিল, রাত্রে আলো একেবারে নিবিয়ে শুয়ো না। এখানে চোর, ডাকাত, বিচ্ছু, করায়েৎ ইত্যাদির উৎপাত আছে।

আমাদের বাতিটা খুব নামিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তুম। দরজাটা ভেজানোই থাকত, কারণ বাইরের ছাতে সারারাত্রি পাহারা থাকত।

সে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়বার পর হঠাৎ কার ভারী গলার আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল। চটকা ভেঙে যেতেই উঠে ব'সে পরিতোষকে ঠেলে তুলে দিলুম। দেখলুম, সামনেই একটা লোক দাঁড়িয়ে, মিস কালো, লম্বা-চওড়া চেহারা, মুখময় বসন্তের দাগ, তাতে একজোড়া ঝাঁটার মতন গোঁফ, ঘর ধান্যেশ্বরীর গন্ধে একেবারে ভরপুর, চোখ দুটো লাল টকটকে, বোধ হয় ধান্যেশ্বরীর ওপরে গাঁজাও চড়েছে। পশ্চিমী ধাচে কোমরে ধুতি বাঁধা, সে এক বীভৎস দৃশ্য ; বঙ্কিনাথ তার কাছে কন্দর্প বললেও অত্যুক্তি হয় না।

উঠে বসতেই লোকটা ভারী গলায় ধমকের সুরে বললে, লাট সাহেবের পোতারা, বাতি জেলেই শুয়ে পড়েছ ! বাবার ঘরের তেল পেয়েছ, না ?

আমরা আর কি বলব ! প্রথম সম্ভাষণেই এমন পুলকিত হলুম যে, আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হ'ল না। ইতিমধ্যে বড়ে সাহেব গা থেকে শালখানা খুলে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপরে লম্বা কোটটা খুলে কাঠের সিন্দুকটা টিপ ক'রে ছুঁড়লেন বটে, কিন্তু সেখানা সিন্দুকের দশ হাত দূরে গিয়ে পড়ল আর তিনি টাল খেয়ে নাচের ভঙ্গীতে দু-পাক ঘুরে গেলেন, কাছেই দেওয়াল থাকায় সে যাত্রা সামলে গেলেন বটে ; কিন্তু আমরা আর থাকতে না পেরে হেসে উঠলুম।

আমাদের হাসি শুনে বড়ে সাহেব উর্দুলেখার ভঙ্গীতে হেঁটে এসে আমাদের বিছানায় ব'সেই চীৎকার ক'রে বললেন, কি, মসকরা হচ্ছে আমার সঙ্গে ! জান তোমাদের মতন পাঁচ-সাতটা লোক খুন ক'রে এই বাড়ির উঠোনে পুঁতে রেখেছি !

কি সর্বনাশ ! অন্তরাত্মা চীৎকার করতে লাগল, জয় বাবা বিশ্বনাথ ! ডাইনীর কবল থেকে উদ্ধার ক'রে শেষকালে ডাকাতের খপ্পরে এনে ফেললে

কেন বাবা? অতি দুর্দিনেও যে আড়াই টাকা খরচ ক'রে তোমার পূজো দিয়েছি!

কি করব, কি বলব, তাই ভাবতে লাগলুম। একবার মনে হ'ল, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যাই দিদিমণির কাছে। ইতিমধ্যে পরিতোষটা ব'লে ফেললে, দিদিমণি রাত্রে বাতি নিবোতে বারণ ক'রে দিয়েছেন, তাই আলো জলছে।

চুপ রহো।—ব'লে লোকটা এমন চীৎকার ক'রে উঠল যে, ছাতের পাহারাদার কিছু হয়েছে মনে ক'রে একবার ঘরে উঁকি দিয়ে চ'লে গেল।

বোধ হয় মিনিটখানেক চুপ ক'রে থেকে লোকটা বললে, বাবুজীর কাছে তোমাদের সব খবর শুনেছি। বাড়ি থেকে ভেগে আসা হয়েছে, না? আমাকে বাবুজী পাও নি, ঠাণ্ডা ক'রে দোব।

রাজকুমারীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে, যা হবার হবে ঝগড়া-মারামারির দিকে আর কখনও যাব না। কিন্তু সে কথা আমার মনে থাকলেও পরিতোষ সাফ ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ সে ব'লে ফেললে, কি করবেন আপনি? মারবেন? কেন মারবেন? কি করেছি আমরা আপনার? বাড়িতে না রাখতে চান, ব'লে দিন, আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি।

পরিতোষের কথা শুনে লোকটা এমন তিড়বিড়িয়ে উঠল যে মনে হ'ল, তার গায়ে যেন নাইট্রিক অ্যাসিড ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ষাঁড়ের মতন একটা ভয়াবহ গর্জন ক'রে সে বললে, কি! আবার চোপরা করা হচ্ছে মুখের ওপর! মারব বিছুয়া।—বলে সাঁ ক'রে কোমর থেকে সাপের মতন অ্যাঁকাব্যাঁকা একখানা চকচকে ছোরা বের ক'রে ধরলে একেবারে পরিতোষের নাকের ওপর। তারপরে কটমট ক'রে চেয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলতে লাগল, আজ তোমাদের শেষ দিন।

"আজ তোমাদের শেষ দিন"—এই ভবিষ্যদ্বাণী ইতিপূর্বে বাবার মুখেও বহুবার শুনেছি। শেষ দিনের শেষ মুহূর্ত অবধি পৌঁছবার সুযোগ না হ'লেও পিতৃপুণ্যের জোরে সে পথের অনেকখানিই আমার জানা ছিল। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাক্যকে নিশ্চিত সাফল্যে পরিণত করবার এমন পরিপাটি ব্যবস্থা তাঁর হাতে ছিল না, তাই এতখানি ভয় ইতিপূর্বে আর কোন দিনই পাই নি।

পরিতোষের তো কথাই নেই, এত বয়স অবধি বাপের হাতে একটা চড় পর্যন্ত কখনও সে খায় নি।

বড়কর্তা বিছুয়া ঘুরিয়ে পরিতোষকে শাসাতে আরম্ভ ক'রে দিলে, সেই ফাঁকে আমি ছুটলুম দরজার দিকে দিদিমণিকে খবর দিতে। আমাকে ছুটতে দেখে বড়কর্তা চেঁচিয়ে উঠল, এইও, কোথায় যাচ্ছ?

বললুম, দিদিমণির কাছে যাচ্ছি, একটু কাজ আছে।

আচ্ছা, চ'লে এস এদিকে। কিচ্ছু বলব না, এস এদিকে।

দিদিমণির নাম করতেই দেখলুম, লোকটা একেবারে নরম হয়ে গেল। আমি ফিরে এসে তার কাছ থেকে একটু দূরে ব'সে পড়লুম। পরিতোষও ইতিমধ্যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ব্যবধানে গিয়ে একটা মোটা গিদ্দে কোলে নিয়ে উঁচু হয়ে বসল। আমি বসতেই লোকটা বললে, আজ আর কিছু বললুম না। ফের যদি আমার সঙ্গে কোন দিন মস্করা করতে দেখি তো জান্‌সে মেরে দেব।

তারপরে ছোরাটাকে তিনবার চুক চুক ক'রে চুমু খেয়ে কোমরে গুঁজতে গিয়ে আবার সেটাকে বের ক'রে এনে বললে, খুন পিলাব ব'লে একে বার করলুম, কিন্তু এখন যদি একে কিছু না দিয়ে খাপে পুরি তো অধর্ম হবে। এই কথা ব'লে সে একবার পরিতোষের ও একবার আমার মুখের দিকে বিমর্ষভাবে তাকাতে থাকল, অর্থাৎ তোমাদের দুজনের মধ্যে যেই হোক একটু রক্ত একে দাও।

আমার মাথার ওপরেই দেওয়ালে সেই আরসিটা ঝুলছিল। টপ ক'রে উঠে মুখ দেখবার ভান ক'রে আয়নাটা দেওয়াল থেকে খুলে নিলুম, উদ্দেশ্য, যদি লোকটা পরিতোষের ওপর কোন অত্যাচার করতে উদ্যত হয় তো এক আয়নার ঘায়ে তাকে গোলোকধামের অন্তত মাঝপথ অবধি পৌঁছে দেব।

কিন্তু আমাদের আর কোন কথা না ব'লে সে নিজের উরুতের কাপড়টা তুলে ছোরার মুখ দিয়ে খ্যাঁচ ক'রে খানিকটা কেটে ফেললে, সেই ক্ষতমুখ দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। সেই রক্তে আমাদের বিছানার খানিকটা লাল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ রক্ত বেরুবার পর সে বললে, ছেঁড়া ন্যাকড়া-ট্যাকড়া আছে?

বললুম, ন্যাকড়া তো নেই।

বড়কর্তা আর কোন কথা না ব'লে ছোরাটা কোমরে গুঁজে উঠে পড়ল। তারপর টলতে টলতে গিয়ে নিজের বিছানার চাদরের খানিকটা পড়পড় ক'রে ছিঁড়ে ফেললে। আমরা মনে করলুম, হয়তো এবার উরুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হবে। কিন্তু তা না ক'রে আবার সেই রকম টলতে টলতে আমাদের কাছে এসে বললে, শিলাই আছে?

দেশলাইটা দিতেই সেই চাদর-ছেঁড়া ন্যাকড়ায় আগুন লাগিয়ে দিলে। তারপরে সেই জলন্ত ন্যাকড়া ক্ষতস্থানে চেপে ধ'রে মুখ থেকে হ্যাক হ্যাক ক'রে খানিকটা থুতু বের ক'রে তার ওপরে চাপাতে লাগল। কিছুক্ষণ এই রকম করবার পর বললে, যাক, থেমে গিয়েছে রক্ত-পড়া।

দেশলাইটা মেঝে থেকে তুলে বড়ো সাহেব আমাদের কাছে এসে বললে, তোমাদের তক্‌দির ভাল, আজ ভারি বেঁচে গেলে।

এবার আমি বেশ মিষ্টি ক'রে বললুম, আপনি আমাদের বড় ভাই, আপনি যদি মেরে ফেলেন তো আমরা কি করতে পারি বলুন, ম'রে যেতে হবে।

আমার কথা শুনে বড়কর্তার মেজাজটা বেশ নরম হয়ে গেল। সে বললে, আচ্ছা, আমায় বড় ভাইয়ের মতন মানিস তো?

নিশ্চয়।

তো, যা জিজ্ঞাসা করব ঠিক ঠিক জবাব দিবি?

নিশ্চয়।

মিথ্যে বললে, আমায় চেনো না, জিন্দা মাটিতে গেড়ে দেব। ও তোমার বাবুজী কি মনোরমা, কি তোদের বাপ এলেও বাঁচাতে পারবে না।

এ কথার আর কি উত্তর দেব! গভীরভাবে গবেষণায় মন দেওয়া গেল, বাবুজী বা মনোরমা কি করবেন জানি না, কিন্তু সত্যিই যদি আমার বাবা এ সময়ে এখানে উপস্থিত হন, তা হ'লে এই জিন্দা গেড়ে দেবার শুভকার্যে তিনি এ ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন কি বাধা দেবেন, তাই নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় চলতে লাগল।

আমার চিন্তাধারাকে চমকে দিয়ে বড়কর্তা খিঁচিয়ে উঠল, কি সাচ্ সাচ বলবি তো?

এবার পরিতোষ বললে, নিশ্চয়ই বলব, আপনি জিজ্ঞাসাই করুন না।

বড়ো সাহেব এবার চক্ষু বুজে কি ভাবতে আরম্ভ করলে তা সে

জানে। আমার মনে হতে লাগল যে, লোকটা বোধ হয় বদ্রিনাথের বন্ধু। কাশীতে হয়তো আমাদের নামে ঢি-ঢি প'ড়ে গিয়েছে, সেসব কথা জানতে পেরে এ ব্যক্তি রাজকুমারী সম্বন্ধেই কোন প্রশ্ন ক'রে বসবে। কিন্তু আমার সব আন্দাজ ব্যর্থ ক'রে দিয়ে চোখ বুজেই সে প্রশ্ন করলে, রোজ কতখানি ক'রে কোকেন খাওয়া হয়?

বলেন কি মশায়! কোকেন-টোকেন আমরা খাই না।

বাড়ি থেকে ভেগেছ বাবা, আর কোকেন খাও না! ন্যাকা বোঝাচ্ছ আমাকে?

এ কথার আর কি জবাব দেব! বাড়ি থেকে ভাগতে হ'লে যে আগে থাকতে কোকেন খাওয়ার অভ্যেস করতেই হবে, এমন কোন শাস্ত্রের সঙ্গে ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় হয় নি।

চুপ ক'রে আছি, এমন সময় বড়দা বললে, আচ্ছা দেখি, জিভ বের কর্ তো!

আমরা একে একে জিভ বের ক'রে দেখালুম, কিন্তু সে ব্যক্তি তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে উঠে গিয়ে কুলুঙ্গিগুলো হাতড়ে হাতড়ে কি খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর আমাদের কাছে ফিরে এসে লোকটা বললে, কি বাবা, ঠিক সরিয়েছ তো?

কি?

মোমবাতি। আমার বড় একটা মোমবাতি ছিল, সেটা পাচ্ছি নে।

আমি বললুম, আপনার মোমবাতি কোথায় গেছে আমরা তা জানি না। আমরা এসে অবধি ও কুলুঙ্গিতে হাত পর্যন্ত দিই নি।

পরিতোষের দিকে চেয়ে দেখলুম, রাগে তার চোখ দুটো রাঙা হয়ে উঠেছে। একটা কিছু হাঙ্গামা বাধাবার জন্যে যেন সে উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা করবার চেষ্টায় আমি বেশ মিষ্টি ক'রে বললুম, এত রাত্রে মোমবাতি কি হবে বড়দা? বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসব?

বড়কর্তা বললে, তোরা কতখানি ক'রে কোকেন খাস তা এক্ষুনি ধ'রে ফেলতে পারতুম মোমবাতিটা পেলে।

কি ক'রে?

মোমবাতির টোপা জিভে ফেললেই বুঝতে পারা যাবে। যদি কোকেন

খাওয়ার অভ্যেস থাকে তো মোমবাতির টোসা পড়লে জিভে লাগবে না, আর না হ'লে জিভ পুড়ে যাবে।

কি সর্বনাশ! মনে মনে বিশ্বনাথকে প্রণাম জানিয়ে বললুম, ভাগ্যে লোকটা মোমবাতি পায় নি!

হঠাৎ পরিতোষ চেঁচিয়ে উঠল, আপনি রোজ কতখানি ক'রে কোকেন খান?

বড়কর্তা বোধ হয় কল্পনাও করতে পারে নি যে, আমাদের তরফ থেকে এমন কোন প্রশ্নের সম্ভাবনা হতে পারে। প্রশ্নটা কানে যেতেই প্রথমে সে চমকে উঠল। তারপর পরিতোষের দিকে কটমট ক'রে চাইতে লাগল। গোড়ার দিকে লোকটার হালচাল ও বিছুয়ার রূপ দেখে মনের মধ্যে যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল, এতক্ষণ কথাবার্তার ফলে সে ভয় অনেকটা কেটে গিয়েছিল। হঠাৎ পরিতোষের গলায় অতি পরিচিত সুর শুনে আমার মনও সাহসে ভ'রে উঠল। আমি তড়াক ক'রে উঠে গিয়ে আয়নাটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে দু-হাত দিয়ে ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। পরিতোষ আমার দিকে একবার দেখে নিয়ে বোধ হয় নিশ্চিন্ত হয়ে আবার সেই সুরেই বড়কর্তাকে বললে, যাও, বাপের সুপুত্র হয়ে ভদ্রলোকের মতন বিছানায় শুয়ে পড়গে। রাত দুপুরে বাড়িতে এসে মাতলামি করতে লজ্জা করে না? এক্ষুনি না শুয়ে পড়লে বাবুজীকে গিয়ে খবর দেব।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল

(পূর্বানুবৃত্তি)

And this defendant further answering denies that shortly or at any time after the death of the said Ramcaunt Roy the said Juggomohan Roy and this defendant caused the said two Talooks to be transferred in the books of the said Collector to the name of Gooroodas Muckerjee a grandson by a daughter of the said Ramcaunt Roy in trust for the joint benefit of the said Juggomohan Roy and this defendant as untruly stated in the Complainants Bill of Complaint But this defendant further answering saith that some time after this defendant had conveyed the said several Talooks to the said

Rajiblochan Roy as hereinbefore in that behalf mentioned a son was born to this defendant whereupon this defendant gave up his intention of leaving the said two Talooks to be enjoyed after his decease by the said Gooroodoss Muckerjee But in as much as the said Rajiblochan Roy had done several acts respecting the said several Talooks in the name of the said Gooroodoss Muckerjee he this defendant did cause a transfer of the said two Talooks to be made in the books of the said Collector of Burdwan to the name of the said Gooroodoss Muckerjee and that shortly after the return of this defendant to Calcutta and when the said Gooroodoss Muckerjee had attained to the age of twentysix years or thereabouts this defendant resumed the said several Talooks and obtained a regular Conveyance and transfer thereof from the said Gooroodoss Muckerjee and in order to compensate the said Gooroodoss Muckerjee for the disappointment which he experienced in consequence of the birth of this defendants said son as aforesaid this defendant did about the same period of time by a Deed of gift transfer to the said Gooroodoss Muckerjee the whole of the right title and share of this defendant of in and to the said house at Nangoorparah in as full and ample a manner as the same had been granted and allotted to him this defendant by his said father under the aforesaid instrument of partition and which share of the said last mentioned house is as this defendant believes now in the use possession and occupation of the said Gooroodoss Muckerjee and this defendant further answering saith that the said Ramlochan Roy departed this life at or about the time in the Complainants Bill in that behalf mentioned leaving him surviving a widow named Labunggoluttah Daby and an only son named Hurgovind Roy, who as this defendant is advised and believes was the sole heir and personal representative of the said Ramlochan Roy and also leaving him surviving a daughter named Drubbamayee who afterwards married one Doorgapersaud Moockerjee by whom she has issue male and female now living and which said Drubbamayee is also now living and this defendant further answering saith that the said Hurgovind Roy departed this life, at or about the time in the Complainants Bill in that behalf mentioned without issue and leaving a widow named Hurrosoondary Dabey him surviving And this defendant further answering admits that the said Labunggoluttah Dabey and Hurrosoondary Dabey or either of them are or is not inhabitants or an inhabitant of Calcutta and that neither of them to the knowledge or belief of this defendant is in any manner subject to the jurisdiction of this Honourable Court And this defendant further answering denies that the said Ramcaunt Roy in his lifetime at any time subsequent to the date of the

said instrument of partition lent to different persons or to any person or persons large or any sums of money out of any joint funds or that any such loans or sums remained due and owing to the said Ramcaunt Roy at the time of his death or that this defendant recovered or got in several or any of such debts no such debts to the knowledge or belief of this defendant having at any time existed But this defendant further answering admits that he this defendant hath since his father's death received the principal and part of the interest of a sum of about Eight thousand Sicca Rupees which he this defendant out of his own funds and some years before the death of the said Ramcaunt Roy lent to the Honourable Andrew Ramsay formerly Commercial resident at Junghipore and this defendant hath also recovered and received the sum of Five thousand Rupees or thereabouts with interest which he this defendant in like manner out of his own proper monies lent to Thomas Woodford Esq. formerly acting Collector at Dacca but this defendant positively denies that the said last mentioned sums or either of them or any part thereof were or was lent to the said Andrew Ramsay and Thomas Woodford respectively either by the said Ramcaunt Roy in his lifetime or out of any joint funds to which the said Ramcaunt Roy Juggomohan Roy or either of them were or was in any manner entitled And this defendant further answering denies that after the death of the said Ramcaunt Roy the said Juggomohan Roy and this defendant purchased out of any joint funds there not having been any such funds after the said partition as aforesaid either in the name of Rajiblochun Roy lent in trust for themselves or otherwise either a certain Putteney Talook called Kissenagur situate in Purgunnah Jahannabad in the Zillah of Burdwan of the value of Sicca Rupees Forty thousand or thereabouts or of any other value or a certain other Putteney Talook called Barlook also situate in the said Purgunnah Jahannabad of the value of Sicca Rupees Sixty thousand or thereabouts or of any other value or a certain other Putteney Talook called Barlook also situate in the said Pergunnah Jahanabad of the value of Sicca Rupees Sixty thousand or thereabouts or of any other value And this defendant further answering denies that the said Juggomohun Roy and this defendant out of any joint funds or otherwise purchased in the name of the said Ramlochun Roy lent in trust for themselves or in the name of any other person the Putteney Talook Nangulparah situate in the Pergunnah of Bayrah and Zillah of Burdwan aforesaid for this defendant further answering saith as the truth is that the said Juggomohun Roy had not at any time any interest whatsoever in the said three last mentioned Talooks or in any or in either of them and that the funds with which the said last mentioned three Talooks were respectively purchased were the proper and exclusive monies of this defendant

ক্রমশ

পদচিহ্ন

ষোল

রাধাকান্ত ডায়েরি লিখছিলেন। আজ নবগ্রামে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘ'টে গিয়েছে। গোপীচন্দ্র দেবতার আশীর্বাদ পেয়েছেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরই রাধাকান্ত ঘটনাগুলি লিখছিলেন। ঘষা কাচের চৌকা লণ্ঠনের মধ্যে বড় মাটির প্রদীপে রেড়ির তেলের আলো জ্বলছে। পাশে তাঁর শিশুপুত্র গৌরীকান্ত শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাধাকান্ত ইদানীং একা হয়ে পড়েছেন। তাঁর একাকীত্বের হেতু তিনি নিজেই। বাইরের সঙ্গে সংস্রব তিনি নিজেই রাখতে চান না। খোলার মধ্যে কচ্ছপের আত্মগোপন ক'রে আত্মরক্ষার যে উপায়, সেই উপায় সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা সম্ভবত স্বভাবজ, বোধ হয় বহুবিবর্তনবাদের মধ্যেও কামড়ানো আঁচড়ানো, সরীসৃপের মত পেষণ করা, লাথি মারা, ঢুঁ মারার অভিজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির মত ওটা মানুষের মধ্যে র'য়ে গিয়েছে। পিঠে খোলার অভাব পূরণ ক'রে দেয় চারিপাশের দেওয়াল এবং মাথার উপরের আচ্ছাদন, তা সত্ত্বেও যারা দরজা ঠেলে নিকটে আসে তাদের কাছে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ মনের ঘরে ঢুকে বসে। এমন ক্ষেত্রে যারা আসে, তারা অল্পক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে আসল মানুষ অর্থাৎ মনকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে যায়। রাধাকান্তের বন্ধুবান্ধব গ্রামস্থ ভদ্রজন এই ভাবেই ফিরে গিয়েছে।

বংশলোচন সেদিন ব'লে গিয়েছেন, আহা-হা! মরি মরি! একেবারে রাধিকার অবস্থা! 'বজ্রমুখী রাই আমাদের ব'সে আছেন একা।'

এতেও কোন উত্তর দেন নাই রাধাকান্ত, শুধু একটু হেসেছিলেন। তিনি গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। অন্তরের মধ্যে অশান্তি অনুভব করেন। মধ্যে মধ্যে নিজেও শিউরে ওঠেন। মনে হঠাৎ প্রশ্ন জেগে ওঠে, আমি কি ঈর্ষার আগুনে পুড়ছি? গোপীচন্দ্রের সম্পদ তার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি কি ঈর্ষান্বিত? নিজের ডায়েরি উল্টেপাল্টে দেখেন। অনেক জায়গায় চোখে পড়ে, গোপীচন্দ্রের সমালোচনা করেছেন, তাঁর কর্মের মধ্যে কূটবুদ্ধির ছায়া দেখে কায়ার অস্তিত্ব অনুমান করেছেন; বার বার সেই জায়গাগুলি প'ড়ে নিজেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। নিজের মনে আপনার ইষ্টদেবতাকে ডাকেন, ডায়েরিতে লেখেন, "হে শঙ্কর দেবাধিদেব, হে মাতঃ অন্নপূর্ণে রাজরাজেশ্বরী, তোমার অধম সন্তানকে কৃপা কর, শক্তি দাও, সুমতি দাও, সম্পদ দাও, প্রচুর অর্থ দাও, তোমার দাসানুদাস আমি, সাধ পূর্ণ করিয়া সৎকর্ম করি; স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা নবগ্রামের সেবা করি, কীর্ত্তিতে কীর্ত্তিতে নানা অলঙ্কারে জননী জন্মভূমিকে কমলার মত রত্নালঙ্কারভূষিতা করিয়া তুলি।"

কোনদিন লেখেন, "আমার জীবনে কোন আশা নাই; আমার গৌরীকান্তের প্রতি কৃপা কর। তাহাকে বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও, সাহস দাও, প্রতিষ্ঠা দাও। বাবা গৌরীকান্ত,

আমার অভিলাষ তুমি পরিপূর্ণ করিয়ো। প্রাণপণে বিদ্যার্জন কর। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। ধনী হইবার চেষ্টা করিয়ো না, তাহাতে নবগ্রামে হয়তো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে, কিন্তু বিদ্বান পণ্ডিত কর্মী হইলে সমগ্র দেশ তোমাকে পূজা করিবে।" গৌরীকান্তকে মুখে বলেন। নিজে পড়ান।

তবুও এর মধ্যেও নবগ্রামের ঘটনাচক্র প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চার করে অথবা বিচিত্র আকস্মিকতার সুযোগ নিয়ে এসে তাঁর জীবনে আবর্তের সঞ্চার করে। আজ তিনি লিখছিলেন, "মনে করি এখানকার কোন ঘটনার সংস্রবে থাকিব না, কোন চিন্তাকে মনে স্থান দিব না। কিন্তু সে বোধ হয় মানুষের অসাধ্য। আষ্টে-পৃষ্ঠে জটিল জালে একের ভাগ্য জীবন, অপর সকল মানুষের ভাগ্য এবং জীবনের সহিত আবদ্ধ। অনুরূপ একটি কর্মের প্রবাহ রহিয়াছে। স্পষ্ট অনুভব করিতেছি। ষোড়শী কোথাকার কে? তাহাকে একদিন আশ্রয় দিয়াছিলাম, কিন্তু রক্ষা করিতে পারি নাই। হতভাগিনী চলিয়া গিয়াছে অধঃপতনের পথে। সে মুছিয়া গিয়াছিল। সে তো কোনদিনই এ সংসারের কেহ ছিল না। বাহির হইতে আসিয়া দুই-চারিদিনের জন্য বায়ুতাড়িত বিহঙ্গিনীর মত আশ্রয় লইয়াছিল। নিজেই উড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং মুছিয়া যাওয়ার পক্ষে বাধাই বা কোথায়? আশ্চর্যের কথা, আজ গোয়ালপাড়ার রঙলালের পুত্র নবীন একটি সুন্দর কাঠের ঘোড়া হাতে করিয়া আসিয়াছিল, বলিল, ষোড়শী এটি গৌরীকান্তকে পাঠাইয়া দিয়াছে। নবীন বর্ধমান গিয়াছিল, ষোড়শীর সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। হতভাগিনী পাপীয়সী। তাহার দেওয়া কোন সামগ্রী গ্রহণ করা উচিত নয়। আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু সমস্ত দিন ষোড়শীর কথা মনে করিতেছি। স্বর্ণের উপর ক্রোধ হইতেছে। স্বর্ণ মনে করে, কৃতকর্মকে চাপা দেওয়া যায়, ভ্রূণের মত হত্যা করা চলে। হায় ভগবান! ভ্রূণকে হত্যা করিয়া জলের তলায় চাপা দেওয়ায় সম্প্রতি একটি পুষ্করিণীতে মাছ মরিয়াছে। গলিত ভ্রূণ ভাসিয়া উঠিয়াছে। পচা মাছ খাইয়া গ্রামে একদফা উদরাময়ের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া গেল। অধিকাংশ লোকের কৃষাণ উদরাময়ে শয্যাশায়ী থাকায় এবার এই জ্যৈষ্ঠ মাসে চাষের ক্ষতি হইল। এই ক্ষতির ফল ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া চলিবে।

"নবীন বলিল, ষোড়শী নাকি ইহারই মধ্যে নিজের অবস্থা সচ্ছল করিয়া তুলিয়াছে। আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। মেয়েটির রূপ আছে, বয়সে যুবতী, সুতরাং দেহ-ব্যবসায়ে অবিলম্বেই তাহার অবস্থা ফিরিবার কথা। ষোড়শী নবীনকে বলিয়াছে, স্বর্ণবাবুর সহিত অথবা অমূল্য-ভূপতির সহিত বায়াস্তরে বিবাদ বাধিলে সে বিবাদে প্রয়োজন হইলে ষোড়শী তাহার যথাসর্বস্ব দিবে। স্বর্ণের কর্ম ফলে পরিণত হইয়া নূতন কর্মবীজ প্রস্তুত করিতেছে। বিবাদের ক্ষেত্র তো প্রস্তুত। নবীনকে তো উদ্যত দেখিলাম।"

"কথাপ্রসঙ্গে ধর্মরাজপূজার সঙের কথা উঠিল, বলিলাম, কাজটা কিন্তু ভাল হয়

নাই তোমাদের। মানীজনের মানহানি করা শুধু অন্যায়ই নয়, অধর্ম। এবং ইহা হইতে বিবাদ বাড়িয়াই চলিবে। নবীন হাসিল। অর্থাৎ বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নয় সে, ইহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল। বুঝিতেছি, বিবাদ বাধিবে। কর্মকে চাপা দেওয়া যায় না, এই তার আর এক নিদর্শন। নবীনকে স্বর্ণ চাবুক মারিয়াছিল; নবীন ফৌজদারিতে মামলায় উদ্যত হইয়া কৃতকার্য হয় নাই, স্বর্ণ আটঘাট বন্ধ করিয়াছিল, এখানেও কেহ নবীনকে সাহায্য করে নাই। স্বর্ণ সেদিন গোঁকে চাড়া দিয়া বলিয়াছেন, ফুঃ। তুলার আঁশ ফাটিয়া বাতাসে উড়িয়া যায় বলিয়া শূন্যেই চিরদিন থাকে না, একদা সে বীজের ভারে মাটিতে পড়িয়া নূতন অঙ্কুরের সৃষ্টি করে। ধর্মরাজপূজার 'সঙ' উপলক্ষ্যে যাহা চাপা ছিল, তাহা দশ-বিশখানা গ্রামে প্রচার হইয়া গেল। নূতন কলঙ্ক রটনা করিয়া নবীন শোধ লইয়াছে। এ গ্রামের চন্দ্র গড়াঞী মুকুন্দ মরবা ইহারা নবীনকে ব্যঙ্গ করিয়া সেই ঘটনাকে আরও স্পষ্ট করিয়া বিবাদ-সংঘর্ষকে অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছে।

"মধ্যে মধ্যে সন্দেহ হইতেছে, কীর্তিচন্দ্রের ইহাতে গোপন প্রেরণা আছে। শুনিলাম, গোপীচন্দ্রও নাকি সঙ দেখিয়া মুচকি হাসিয়াছিলেন।"

হঠাৎ লেখা বন্ধ করলেন রাধাকান্ত। গোপীচন্দ্র কীর্তিচন্দ্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ক'রেই তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন। এ কি করছেন তিনি? ঘটনাপ্রবাহের গতি অপ্রতিহত, কর্মফল বিচিত্র ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করে। এ মহাসত্যকে স্বীকার ক'রেও তিনি কীর্তিচন্দ্র-গোপীচন্দ্রের উপর দোষ দিচ্ছেন কেন? তবে পরিকল্পনা বুদ্ধিমানের, তাতে সন্দেহ নাই।

ধর্মরাজপূজার শেষদিন অর্থাৎ 'ভাঁড়াল' মিছিলের দিন এই ব্যাপারটা ঘ'টে গিয়েছে। বৈশাখী পূর্ণিমার দ্বিপ্রহরে ভক্তেরা ফুলের মালায় সজ্জা করে, গলায় গুলঞ্চ চাঁপার মালা, মাথায় রাঙাজবার মালা পরে, কেউ এক-গাছা, কেউ দু-গাছা, কেউ চার-গাছা, মাথায় গামছার বিঁড়া নিয়ে তার উপর নেয় পূর্ণ কুম্ভ, সিন্দূর চন্দনে বিচিত্রিত কুম্ভ, তার উপর মোটা ফুলের মালা পরিয়ে দেয় কুম্ভের গলায়। তারপর ভক্তদের প্রবীণত্ব এবং গুরুত্ব বিচার ক'রে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। এক এক সারিতে পাঁচজন অথবা সাতজন অথবা নয়জন দাঁড়ায়; সারির পিছনে সারি। সর্বাগ্রে থাকে ঢাকের দল, ঢাক এবং ভক্তদের মধ্যে থাকেন দেবাংশী এবং পরিচারকেরা। প্রকাণ্ড বড় বড় ধুনুচিতে গনগনে আগুনের মাথা থেকে ওঠে ধূপের ধোঁয়া। বৈশাখের দুপুরের রৌদ্রে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে থাকে নীলাভ রঙ ধ'রে। ঢাক বাজে ধেরে-দান্-দেরে দান্-দেরে দান্-ধেরে-দান্, দুড়ুম্-দুড়ুম, দে-রে, দে-রে, দেরে-দেরে, দুড়ুম্।

বায়েনরা বলে, শিবরাম-শিবরাম-শিবরাম-শিবরাম, শিবম্-শিবম্, রাম-রাম-রাম-রাম শিবম্।

ভক্তরা নাচতে নাচতে চলে, বলো শিবো, ধম্মর—জ্ঞো—! হে ধরম! মধ্যে মধ্যে নাচে মাতন ধরে। তখন ঢাকীরাও নাচে, তাদের কেশর ফুলো নাচে ঢাকের মাথায়, তখন মুখে বলে, ভক্ত নাচে! ভক্ত নাচে! ভক্ত নাচে! ভক্ত নাচে! রাজো রাজো রাজো রাজো ধর্মরাজো ধরমের ভক্ত নাচে! ধর্মরাজো।

বৈশাখের আকাশ, রৌদ্রের উত্তাপে খাঁ-খাঁ করা আকাশের কোলে কোলে সে প্রচণ্ড শব্দ পরিপূর্ণ হয়ে অদৃশ্য সঞ্চারে সঞ্চরণ করে। আকাশের বায়ুস্তর কাঁপে, বায়ুস্তরে ভাসে যে গ্রীষ্মের জলশূন্য শুষ্ক ধূলিকণা ধ্বনির আঘাতে সেগুলি চঞ্চল হয়ে ফেরে।

ভক্তদের পিছনে থাকে গ্রামের মানুষ। হরিজনদের আবালবৃদ্ধবনিতা। বণিক সাহা গন্ধাঐীদের শূদ্রদের পুরুষেরা থাকে, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীরা যুবতীমণ্ডলীর পাশে পাশে চলে। তাদের পিছনে থাকে সঙ।

শিব-দুর্গা সাজায়। নন্দী-ভৃঙ্গী থাকে। ভূতপ্রেত থাকে। পূর্বকালে মানুষের দশ দশা সাজানো হ'ত। কৃষ্ণরাধাও সাজায়। এসব এখন কম। এখন বেশি হয়, সঙের মধ্য দিয়ে নবগ্রাম করে গোয়ালপাড়াকে ঠাট্টা, গোয়ালপাড়া করে নবগ্রামকে ঠাট্টা। গতবার নবগ্রাম সাজিয়েছিল—এক চাষা হরিতকীর মোরব্বার আঁটি হাতে নিয়ে প্রচণ্ড ভাবনায় পড়েছে। কাগজে লিখে দিয়েছিল মোটা মোটা হরফে এবং যে চাষা সেজেছিল সে সুর ক'রে ছড়া কেটে বলছিল, "সন্দেশের মধ্যে আঁটি? পুঁতলে তো বিক্ষ (বৃক্ষ) হবেন খাঁটি! ওরে বাপা খুঁড়ে ফেল, খুঁড়ে ফেল রে হেঁসেলে (রান্না) ঘরের মাটি। আহা! পুঁতবার আগে আমি আরও দুবার চাটি।" ব'লে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে আঁটিটি চাটছিল। গোয়ালপাড়া গতবার সাজিয়েছিল ফক্কাবাবু। বাবুর মা সাজিয়েছিল একজনকে, সে ধান ভানছিল, আর সিগারেট মুখে দিয়ে বাবু এলাচ খাচ্ছিলেন। "মা খায় ধান ভেনে—ছেলে খায় এলাচ কিনে" এই প্রবাদটা একটা কাগজে লিখে দিয়েছিল।

এবার সঙে অভাবনীয় ব্যাপার ঘটেছে। দুপক্ষেরই সঙের তীব্র ব্যঙ্গ শ্লেষ বর্ষিত হয়েছে স্বর্ণবাবুর উপর। নবগ্রামের সঙে নবীনকে ঠাট্টা করেছে, স্বর্ণবাবুর হাতে চাবুক খাওয়া নিয়ে। একজন সেজেছিল জমিদার, জমিদারটিকে যথাসম্ভব স্বর্ণবাবুর সাদৃশ্য দেবার জন্য একজোড়া সূক্ষ্মাগ্র গোঁফ এঁকে দিয়েছিল কালি দিয়ে; মাথায় চুলের সঙ্গে একটি টিকি বেঁধে দিয়েছিল। জমিদার স্বর্ণবাবুর অভ্যাস অনুরূপ বাঁ হাতে কখনও টিকিতে পাক দেওয়ার কখনও গোঁফে পাক দেওয়ার অভিনয় করেছিল, আর ডান হাতে ঘোড়ার চাবুক তুলে চোখ রাঙা ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, সামনে একজন চাষীর ছেলে সেজে পিঠে চাবুকের দাগ লাল কালিতে তুলি দিয়ে এঁকে একটি হাত কানে অপর হাতটি নাকে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নাকে ধুলো দিয়ে 'নাকখত' দেওয়ার চিহ্নও এঁকে দেওয়া

হয়েছিল। আর একটিতে গোপীচন্দ্র যে গোয়ালপাড়ার নতুন জমিদার হয়েছেন, তাই নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিল গোয়ালপাড়ার লোকদের। সেটা করেছিল এইভাবে, একজন অবস্থাহীন জমিদার দপ্তর বগলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ম্লান মুখে, তার সামনে চাষীপ্রজারা তর্জনী হেলিয়ে বলছে 'নেহি দেঙ্গা'। অর্থাৎ খাজনা। তার পিছনে গোপীচন্দ্রের মত ধরন-ধারণ ক'রে নতুন জমিদার ঢুকছেন গ্রামে, হাতে তাঁর দণ্ড, তাঁর সামনে চাষীরা আকর্ণবিস্তার হাসি হেসে বলছে, আসুন, আসুন। অন্য একটায় করেছিল ষোড়শীকে নিয়ে ব্যঙ্গ। একজন বাইজী সেজে কুৎসিত ভঙ্গীতে গালে একটি আঙুল রেখে অন্য হাতের আঙুল দিয়ে তার পা দেখিয়ে দিচ্ছে। কাগজে লিখে দিয়েছে "এস গো বাবুরা মোর চরণ-ধরণে; স্বর্গে যাব চাষার মেয়ে ফাটা চরণে।"

আশ্চর্যের কথা তিনটি সঙেই বিদ্ধ হয়েছেন স্বর্ণবাবু। গোয়ালপাড়ার চাষীরা কতখানি লজ্জা পেয়েছে বা তাদের অঙ্গজ্বালা কতখানি হয়েছে, সে কথা রাধাকান্ত জানেন না। কিন্তু তিনটি সঙ দেখেই লোকে স্বর্ণবাবুকে মনে না ক'রে পারে নাই। স্বর্ণবাবু নিজেও এগুলির প্রত্যেকটিকে নিজের প্রতি নিক্ষিপ্ত বাণ ব'লে বুক পেতে নিয়েছেন। যে সঙটিতে অবস্থাহীন জমিদারকে উপেক্ষা ক'রে চাষীরা মুষলহস্ত গোপীচন্দ্রের কাছে নতজানু হয়েছে, সেটিতেও তিনি নিজেকে অবস্থাহীন জমিদারদের মধ্যে ফেলা হয়েছে এবং গোপীচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা ক'রে তাঁকে ছোট করা হয়েছে ভেবেছেন। ষোড়শীকে নিয়ে সঙটিতে তাঁর ব্যথা অত্যন্ত গোপন। এটাও যে তিনি তাঁর প্রতি ব্যঙ্গ ব'লে গ্রহণ করেছেন, এ কথা অন্য কেউ বুঝতে না পারলেও রাধাকান্ত বুঝেছেন।

গোয়ালপাড়াও সঙ দিয়েছে মর্মান্তিক ব্যঙ্গ ক'রে।

প্রথম সঙে একটা আবলুশের মত কুচকুচে কালো ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে তার দুই হাতের সঙ্গে দড়ির বাঁধন দিয়ে পাখার মত বেঁধে দিয়েছিল দুখানা কুলো। অর্থাৎ পরী। তার মাথায় একটা ঝুড়ি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল সে মজুরনী অর্থাৎ ছোট জাত। একটা বস্তার মধ্যে কাগজ পুরে কালো রঙ দিয়ে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে পায়ের কাছে রেখে দিয়েছিল, গায়ে লিখে দিয়েছিল 'গুয়ার'। পরীটার সামনে একজন বাবু, তাঁর পিছনে বাবুদের ছোকরার দল, তাদের পিছনে আর একদল, কারও হাতে দাঁড়িপাল্লা, কারও হাতে মিষ্টির পাত্র, কারও হাতে তেলের ভাঁড়, কারও হাতে মদের হাঁড়ি অর্থাৎ বেনে-ময়রা-কলু-শুঁড়িদের সকলে। সামনের বাবুটির সঙ্গে ওরা অবশ্য স্বর্ণবাবুর সঙ্গে কোন প্রকার সামঞ্জস্য রাখে নি, কিন্তু তিনি যে স্বর্ণবাবু এ সম্বন্ধে কোন সংশয়ই থাকে না। ঘটনা যেখানে সর্বজনবিদিত সত্য এবং দিনের আলোর মত স্পষ্ট, সেখানে সামান্য উল্লেখে অথবা অস্পষ্ট হ'লেও ইঙ্গিত মাত্রেই তা মানুষের মনে আপনা থেকে জেগে ওঠে। এই সঙটি দেখে গোপীচন্দ্র মুচকে হেসেছেন।

দ্বিতীয় সঙে গোয়ালপাড়া গোপীচন্দ্রের স্তুতি করেছে। শিব-দুর্গার সামনে গোপীচন্দ্র নতজানু হয়ে বসেছেন, তাঁরা আশীর্বাদ করছেন তাঁকে, পিছনে একজন সাহেব অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দাঁড়িয়ে গোপীচন্দ্রের পিঠে হাত দিয়ে সমাদর করছেন অথবা পৃষ্ঠ-পোষকতা করছেন।

গোপীচন্দ্র গোয়ালপাড়ার নতুন জমিদার হয়েছেন, এজন্য তাঁর স্তুতি করেছে তারা। সঙ্গে সঙ্গে পুরানো জমিদারদের প্রতি তাদের বীতরাগও প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। অন্তত তাই মনে করছেন অন্য সকল জমিদার এবং স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিরা। সবচেয়ে বেশি মনে করছেন স্বর্ণবাবু। কারণ পুরানোর প্রধানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রধানতম।

এইটুকু নিয়ে রাধাকান্তের সন্দেহ ছিল। গোপীচন্দ্রের স্তুতি করার অভিপ্রায়ের অন্তরালে অপর সকলকে অবজ্ঞা উপেক্ষা এমন কি তাঁদের অবনতি-কামনা লুকানো আছে, এ কথাটা বার বার তাঁর মনে হয়েছে; কিন্তু তিনি নিজেই নিজের এ কল্পনাকে শাসন করেছেন, সংযত করেছেন, অস্বীকার করেছেন। নিজেকেই নিজে বলেছেন, ছি ছি! এ কথা মনে করছি কেন? একজনের মঙ্গলকামনা করলেই কি অপরের অমঙ্গলকামনার অভিপ্রায় সন্দেহ করতে হবে? এ যে মক্ষিকাবৃত্তি!

আজ এ বিষয়েও রাধাকান্তের সন্দেহ সংশয় দূর হয়েছে। নবীনের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে তিনি নিঃসংশয় হয়েছেন যে, গোয়ালপাড়ার লোকের মনে ওই কদর্য অভিপ্রায়টা সত্যই ছিল। তিনি সঙের কথা তুলে বলেছিলেন, কাজটা তোমরা ভাল কর নাই বাপু।

নবীন নিরুত্তর হয়ে রইল, কিন্তু গোপন তৃপ্তির খানিকটা হাসি সে গোপন করতে পারলে না। মুচকে হেসে ফেলে সে মুখ নামালে।

রাধাকান্ত এবার প্রশ্ন করলেন, তা হ'লে বিবাদ করাই তোমাদের অভিপ্রায়?

আজ্ঞে? নির্বোধের মত মুখ তুললে নবীন।

বিবাদই তা হ'লে চাচ্ছ তোমরা?

আজ্ঞে না। সঙ দিয়েছি, সঙে নানারকম দেয়, তা ঝগড়া-বিবাদের জন্যে তো দেয় না।

সে সত্যি। কিন্তু এতে স্বর্ণবাবু এবং আর সব বাবুর অপমান তো হয়েছে। এটা তো বুঝতে পারছ?

কপালে সারি সারি রেখা ফুটে উঠল নবীনের। সে বললে, অপমান যদি হয়ে থাকে তবে মানহানির নালিশ করুন বাবুরা।

দপ ক'রে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল যেন। রাধাকান্তবাবু চোখ বুজলেন,

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। নিজেকে সংযত করার এটি তাঁর একটি অভ্যাস-করা পন্থা। তাঁকে বলেছিলেন এক সাধু।

নবীন কিন্তু ক্ষান্ত হ'ল না, সে ব'লেই গেল, কাউকে অপমান করার ইচ্ছে ছিল না আমাদের বাবু। তবে এ গাঁয়ের বাবুদের ধারাধরন নিয়ে সঙ দিতে গিয়ে ওটা হয়ে গিয়েছে। বাউড়ীদের মেয়েটা—ওই সাতন বাউড়ীর বুনটাকে নিয়ে যে কেলেঙ্কারি আপনাদের গাঁয়ে হচ্ছে, সেটা ভেবে দেখুন। তাই আমরা ওটা দিয়েছি। কেলেঙ্কারি নিয়েই তো সঙ। আসল ঘটনাটা যদি মিছে হয়, শাস্তি নিতে রাজি আছি আমরা। আপনাদের গাঁ থেকে আমাকে চাবুক মারার ব্যাপার নিয়ে সঙ দিয়েছে। তাতে না হয় আমার খোয়ার হয়েছে, কিন্তু বাবুর কি তাতে 'গৈরব' (গৌরব) বেড়েছে? আপনিই বলুন। আবার এই যে গোপীচন্দ্রবাবুকে নিয়ে সঙ দিয়েছি, তাতে তো তাঁর সম্মানই করেছি আমরা। এ নিয়ে আপনারা রাগ করলে আমরা আর কি করি বলুন? জানব আমাদের অদেষ্ট (অদৃষ্ট)।

রাধাকান্ত বললেন, দেখ, আমার রাগের কথা কিছু নাই এর মধ্যে। আমি জমিদার নই। জমিদারেরা যা ভাবছেন, আমারও যা মনে হয়েছে, তাই বললাম। সংসারে বিবাদ বৃদ্ধি ক'রে লাভ কি?

অন্যায় সহ্য না করতে পারলেই যদি বিবাদ হয় বাবু, তবে বিবাদ হওয়াই ভাল। আর আমরা সইতে পারছি না।

একটু চুপ ক'রে থেকে নবীন হেসে বললে, এবার আর বিবাদ সহজ হবে না বাবু। গোপীচন্দ্রবাবু জমিদার হয়েছেন, আমরা একটা আশ্চয় (আশ্রয়) পেয়েছি।

চমকে উঠলেন রাধাকান্ত। কি বললে?

গোপীচন্দ্রবাবু জমিদার হয়েছেন এবার। স্বর্ণবাবু কি বংশলোচনবাবুরা আর যা-মন তাই করতে পারবেন না।

তা হ'লে খুশি হয়েছ তোমরা?

তা হয়েছি আজ্ঞে।

এতদিনের পুরনো জমিদার, অবস্থা খারাপের জন্যে জুলুমও ছিল না তার, তার জন্যে দুঃখ হয় না তোমাদের?

চুপ ক'রে রইল নবীন। এ কথার উত্তর দিতে পারলে না।

কি হে?—হেসে প্রশ্ন করলেন রাধাকান্ত।

নবীনের কপালে আবার সারি সারি রেখা দাঁড়িয়ে উঠল। নখ দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে বললে, তা আজ্ঞে, বড় বাপের ছেলে হতে কার না সাধ হয় বলুন? জমিদার যার নাম, তিনি যদি জমিদারের মত না হন, তবে আর জমিদারি করা ক্যানে তাঁর?

৩৫

জমিদার পাঁচটা কীর্তি করবেন, দান ধ্যান করবেন, দশটা লোক তাঁর কাছে হাত পাতবে, নাম করবে। আমাদের জমিদার বলতেও তো বুকটা আমাদের ফুলে ওঠে আজ্ঞে। নজ্ঞা না, জমিদার এ বেলা আসছে, উ বেলা আসছে। চারটি শাক, দুটো লাউডগি, দু গণ্ডা মাবেগুন, চার গণ্ডা মূলো, আধ সের মাছ, আজ এক টাকা, কাল দু টাকা, টাকা না হয় পেঁচাট গণ্ডা পয়সা, এ যারা করে তাদের জমিদারিতে কাজই বা কি, আর তাকে জমিদার বলতেই বা মন হবে ক্যানে, বলুন?

সং অকৃতজ্ঞ মানুষ, কদর্য মানুষ! ঘৃণায় ভ'রে গেল রাধাকান্তের অন্তর। তিনি বললেন, অকিন্তু গোপীচন্দ্রবাবু—থাক্, তাঁর কথা থাক্। তিনি সত্যই মহাপুরুষ ব্যক্তি। কিন্তু কেতাঁর ছেলে কীর্তিচন্দ্রকে তো জান। তিনি জমিদার হ'লে শাসনটা কি রকম হবে, বুঝতে পারছ তো?

নবীন বললে, তা তিনি রাজা তুল্য লোক, জমিদার শাসন করবেন বইকি।

অ অত্যাচার করলে কি হবে?

অ তা যদি করেন তো সে আমাদের অদেষ্ট।

শ বাইরে থেকে স্বর্ণবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, রাধাকান্তদা!

দ্বি সঙ্গে সঙ্গে বংশলোচনও ডাকলেন, গোপেশ, গোপীকাকান্ত, রাধাকান্ত হে!

অ রাধাকান্ত চেয়ার ছেড়ে উঠলেন; অদ্ভুত সমন্বয় তো! স্বর্ণভূষণ এবং বংশলোচন দুজনে একসঙ্গে! বিশেষ ক'রে ইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উৎসবে, গোপীচন্দ্র ও বংশলোচন সম্প্রীতি এবং সাম্প্রতিক গোয়ালপাড়ার অংশ ক্রয়বিক্রয়ে স্বর্ণভূষণ-শ্যামাকান্ত-বংশলোচন প্রতিযোগিতা, অবশেষে বংশলোচনের দৌত্যে কীর্তিচন্দ্রের রঙ্গভূমে প্রবেশ ও শ্যামাকান্ত ও স্বর্ণের পরাজয় অধ্যায়ের মাস দুয়েক না যেতেই কোন্ যাদুতে এঁরা দুজনে একত্রিত হয়েছেন? বিস্মিত হয়েই তিনি আহ্বান করলেন, এস এস।

নবীন বললে, তা হ'লে আমি যাই বাবু।

কাঠের ঘোড়াটি দেখিয়ে রাধাকান্ত বললেন, ওটাকে আমি ছোঁব না বাপু, তুমি ওটা নিয়ে যাও।

নিয়ে যাব? ষোড়শী কিন্তু বলেছে, বাবাকে মাকে বলবে।

থাক্। এবার যখন ষোড়শীর সঙ্গে দেখা হবে, তখন ব'লো, আমাদের বাবা-মা বলতে আমি বারণ করেছি।

আজ্ঞে বাবু।

না নবীন, সে কথা তোমরা বুঝবে না। বুঝলে, তুমি ষোড়শীর সঙ্গে দেখা করতে না। নিয়ে যাও।

নবীন ঘোড়াটি তুলে নিয়ে চ'লে গেল। চ'লেই যাচ্ছিল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে ফিরে মুখে

বললে, প্রণাম। ব'লেও কপালে হাতটি শুধু ছুঁইয়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি নমস্কার করলে। সেই মুহূর্তটিতেই বারান্দায় উঠলেন স্বর্ণভূষণ এবং বংশলোচন। নবীন পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল।

স্বর্ণবাবু তাকে তীর্যক দৃষ্টিতে দেখে ঘরের দিকে এগিয়ে এলেন; কিন্তু বংশলোচনের সে স্বভাব নয়, তিনি কথা না বলে ছাড়লেন না, মৃদু হাস্য ক'রে বললেন, কি হে, নবীনচন্দ্র যে! কি সংবাদ?

নবীন ঘাড়টি ঈষৎ নুইয়ে বললে, প্রণাম। এই এখানে একবার বাবুর কাছে এসেছিলাম।

সে তো স্বচক্ষেই দর্শন করছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

একটু কাজ ছিল।

তা তো ছিলই, নইলে রাধাকান্তবাবুর বদন তো চন্দ্রবদন নয় যে, দেখতে এসেছিলে শুধু শুধু।

নবীন নিরুত্তর হয়ে রইল।

ও। গোপনীয়!

আজ্ঞে না, গোপনীয় কিছু নয়, তবে হ্যাঁ—

হ্যাঁ। গোপনীয় নয়, তবে বলা যায় অন্যকে। বেঁচে থাক, বেঁচে থাক। তা হ্যাঁ বাবা, আমাকে যে প্রণামটি করলে, ও প্রণামটি কার কাছে শিখেছিলে?

আজ্ঞে?

কর্ণে তো বধির নও বাবা, শুনতে তো পেয়েছ। স্বর্ণবাবুকে তো গ্রাহ্যই করলে না।

নবীন এবার কোন উত্তর না দিয়ে হনহন ক'রে চ'লে গেল।

বংশলোচন স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। স্বর্ণবাবু বললেন, এস এস, ভেতরে এস। একটা চাষীর প্রণামের জন্যে এত বকবক করে না।

বংশলোচন বললেন, বাকুম্ কুম পায়রা হব, কোন বেড়ালের পেটেতে যাব। যাও বাবা তাই, বনবেড়ালের পেটেই যাও, কীর্তিচন্দ্রের পেটেই যাও।

ভিতরে এসে বললেন, গোপনীয় কথাটা কি হে রাধাকান্ত?

থাক সে কথাটা লচুকাকা। এখন তোমাদের কথা বল।

গোপীচন্দ্রের পুকুরে নারায়ণ-বাসুদেবমূর্তি উঠেছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। কালাপাহাড়ের আমলের মূর্তি বোধ হয়। সমস্ত গ্রামের লোক, হৈ-হৈ ক'রে গিয়ে জুটেছে—পাঁচখানা গ্রামের লোক। ঢাক-ঢোলের ব্যবস্থা হচ্ছে। সমারোহ ক'রে নিয়ে আসবে। যাবে নাকি একবার?

স্বর্ণবাবু এতক্ষণ পর্যন্ত নীরব হয়েই ব'সে ছিলেন, তিনি এবার বললেন, খুড়ো গিয়ে বললেন, চল, দেখে আসি। তা তুমি যদি যাও তো যাই রাধাকান্তদা।

বাসুদেবমূর্তি উঠেছে গোপীচন্দ্রের পুকুর থেকে। শত শত বৎসর পূর্বে যে দেবতা অপমানিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল পুষ্করিণীর গর্ভে, শত শত বৎসর ধ'রে পাঁকে পলিতে স্তরে স্তরে জ'মে যাকে বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত ক'রে রেখেছিল, এতকাল পরে তিনি উঠলেন!

শঙ্খচক্রগদাপদ্মশোভিত হস্ত, ত্রিলোকের পালক বিষ্ণু, আবার উদিত হলেন নবগ্রামের ভাগ্যে! গোপীচন্দ্রের কীর্তির মধ্য দিয়ে তিনি উত্থিত হলেন! পরিপূর্ণ হয়েছে গোপীচন্দ্রের সৌভাগ্য, আজ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দেবতা উঠে ঘোষণা করছেন। এ মুহূর্তে তাঁকে যেতে হবে বইকি। না গেলে তাঁকে যে অপরাধী হতে হবে। রাধাকান্ত বললেন, যাব।

এই! হ'ল তো! ওঠ। চল।—বংশলোচন বললেন স্বর্ণবাবুকে।

স্বর্ণবাবু বিস্মিত হয়ে রাধাকান্তের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, সত্যিই যাবে নাকি?

যাব বইকি। ওরে, আমার জামাটা আন্ তো। আচ্ছা, আমি নিজেই আসছি বাড়ির ভেতর থেকে।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী

৩

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট, জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, তোমার চিঠি পেলাম। গোড়াতেই লিখেচো যে, বেশ বোঝা যাচ্চে যে আপনি আমার ওপরে ক্রমেই অখুসি হয়ে উঠচেন। অখুসির মানে যদি হয় বিরক্তি তা হলে উত্তরে বোল্‌বো নিশ্চয়ই না। আর অখুসির মানে যদি হয় গভীরভাবে ব্যথিত, তাহলে বোস্‌বো নিশ্চয়ই হাঁ। বস্তুতঃ, তোমাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি, তাই যখনি মনে হয় দিন শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু এ জীবনে আর তোমাকে দেখতে পাবোনা তখন এমন একটা কষ্ট হয় যে সে তোমাদের সাধন-ভজন করার দলে কেউ বুঝবে না। সুতরাং, এ সকল কথার প্রয়োজন নেই। জীবনে অনেক দুঃখই নিঃশব্দে সয়ে গেছি, এও একটা।

তোমার চিঠির আবশ্যকীয় অংশগুলোর একটা একটা ক'রে জবাব দিই। তোমাদের নতুন কাগজ আমাকে পাঠিও। আমি ছাড়া পরিচিত যারা, তাঁদেরও নেবার জন্যে বলে

দেবো। তোমার লেখা বেরুবে, ওটা পড়বার আমার সত্যিই আগ্রহ হয়। তুমি লিখেচো সাহিত্য ব্যাপারে আমার কাছে তুমি ঋণী,—অন্ততঃ এর সংযম সম্বন্ধে। ঋণের কথা আমার মনে নেই, কিন্তু এই কথাটা তোমাদের অনেকবার বলেচি যে কেবল লেখাই শক্ত নয়, না-লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ, ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন ক'রে না রাখি। অ-লিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব, রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ ক'রে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইঙ্গিত করবে, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি বইবে না। জ··· তাঁর কি একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপ মায়ের হয়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলেন যে পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইলো, কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুতঃ, লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে দেয়। কে··· চমৎকার লিখতেই পারেন, কিন্তু চমৎকার না-লিখতে পারেন না। আর এক ধরণের অসংযম দেখতে পাই অ···র লেখায়। ছেলেটি লেখে ভালো, বিলেতেও গেছে,—এই যাওয়াটা ও একটা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না। বিলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখায় এমনি একটা অরুচিকর ভক্তিগদ্‌গদ 'আদেকুলে-পণা' প্রকাশ পায় যে পাঠকের মন উৎপীড়িত বোধ করে। আমার গিরীনমামাকে মনে পড়ে। একবার বৈষ্ণব মেলা উপলক্ষে আমরা শ্রীধাম খেতুরিতে গিয়েছিলাম। মামার বিশ্বাস ছিল খেতুরির প্রসাদ খেলে অম্বল সারে। ষ্টীমার থেকে গঙ্গার তীরে নেমেই মামা অ্যাঃ—করে উঠ্‌লেন। দেখি ভয়ার্ত্তমুখে এক পা উঁচু করে আছেন।

কি হোলো?

বড্ড কাঁচা শ্রীগু মাড়িয়ে ফেলেচি।

তাঁর ভয় ছিল, ভক্তি-হীনতা প্রকাশ পেলে হয়ত অম্বল সারবে না। তোমার দোলার ব্যাপারটাও বিলেতের। সেদিন কয়েকটা অধ্যায় পড়ছিলাম। তাতে এই অহেতুক ভক্তিবিহ্বলতা, অকারণ, অসংযত বিবরণের ঘটাপটা নেই। মনে হয় এও বিলেতে গেছে, জানেও অনেক কিছু কিন্তু জানানোর মাতামাতি নেই। এইটুকু সর্ব্বদাই মনে রেখো মণ্টু। আমি আশীর্ব্বাদ করচি একদিন তুমি বড় হবে। অ···র লেখার সম্বন্ধে আমার অভিমত কেউ যদি challenge ক'রে বলে কই দেখাও দিকি। আমাকে প্রত্যুত্তরে হয়ত শুধু এই কথাই বলতে হবে যে এ সব জিনিস এমন কোরে দেখানো যায় না। ও রসজ্ঞ পাঠকের মন আপনি অনুভব করে। অ···দেবীর উপন্যাসে দেখতে পাবে বেদ বেদান্ত উপনিষৎ পুরাণ কালিদাস ভবভূতি সবাই চোকবার জন্যে যেন ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দেয়। ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের এই মনোভাবটিই ধরা পড়ে,—ছাখো তোমরা আমি কি বিদুষী! কি পড়াটাই পড়েছি, কি জানাটাই জেনেচি। এই

আতিশয্য যেন কোনমতেই না লেখার মধ্যে ধরা পড়ে। ওদের এম্‌নি সহজে আসা চাই যেন না এলেই নয়। এই না-এলেই-নয় জিনিসটাই লেখার বড় কৌশল। এ শেখানো যায় না—আপনি শিখতে হয়। আর শেখা যায় শুধু সংযমের অভ্যাসে। পাঠককে তাক লাগিয়ে দেবার সদিচ্ছার বাহুল্যে তার স্বকীয় কল্পনার খোরাকে কখনো কৃপণতা কোরব না এই তত্ত্বটি লেখবার সময়ে একটি মিনিটের জন্যেও ভুল্‌লে চল্‌বে না। অথচ, বড় ভাব, বড় তত্ত্ব, বড় idea, বড় প্রকাশ, এই নিয়েই চলা চাই লেখা,—জল পড়ে, পাতা নড়ে, লাল ফুল, কালো জল আর যারে যারে ঝগড়া আর বৌয়ে বৌয়ে মনোমালিন্য কিম্বা প্র···র বর্ণনায় নিপুণতা,—ঘরের মধ্যে ক'টা আলমারি ক'টা সোফা, প্রদীপে ক'টা শল্‌তে দেওয়া এবং আলনায় ক'টা এবং কি পাড়ের কোঁচানো শাড়ী—এ সকলের দিনও গেছে, প্রয়োজনও শেষ হয়েছে। ও কেবল লেখার ছলে সাহিত্যকে ঠকানো।

তোমার লেখার মধ্যে আজকাল আমি অনেক আশা অনেক ভরসা পাই। অথচ, মনের মধ্যে বেদনা বোধ করি যে এ তুমি ছেড়ে দিলে। আশ্রমে বাস করে সে বস্তু কখনো হবে না। জীবনে যে ভালোবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না তার পরের-মুখে-ঝাল-খাওয়া-কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কত দিন জোগাবে? নাকটেপা-প্রাণায়ামের যোগবলে আর-যা-কিছুই হোক্ এ বস্তু হবে না। নিজের জীবনটাই হোলো যার নীরস, বাঙ্‌লা দেশের বাল-বিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম যৌবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দুদিনে সব মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠ্‌বে। ভয় হয়, ক্রমশঃ হয়ত তোমার লেখার মধ্যেও অসঙ্গতি দেখা দেবে। সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সবকিছু ফুলের মতো বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখোনি বাঙ্‌লা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন-সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত। আমার কথা যাক্। তোমার নিজের কথায় একদিন আমি ভেবেছিলাম মণ্টু যে ব্যারিষ্টর হয়ে আসেনি সে ভালোই হয়েছে। না-ই করলে ও রাশি রাশি টাকা রোজগার, না-ই চড়ে বেড়ালো মটরগাড়ী, নাই হোলো হাই সার্কেলের কেও-কেটা। ওর অভাব নেই, যা-আছে বেশ চলে যাবে,—শুধু সঙ্গীত ও সাহিত্যে দেশকে অনেক কিছু যেন মণ্টু দিয়ে যেতে পারে। সে নিরানন্দ দেশের আনন্দের ভোজ, —সেই আমাদের চেয়। আমি আরও একটা কথা ভাবতাম। মণ্টু এই যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, ও অনেক জাত অনেক সমাজ অনেক লোকের সঙ্গে বাঙ্‌লা দেশের একটা স্নেহ ও শ্রদ্ধার বাঁধন বেঁধে দিচ্চে। ওকে সবাই চেনে, সবাই ভালোবাসে। মণ্টুর

সঙ্গে গেলে কোথাও আদরের অভাব ঘট্‌বে না। কিন্তু সে আশা সে আনন্দে ছাই পড়লো। যার দেহের, মনের আনন্দের, সামাজিকতার স্বাধীনতার সীমা ছিল না সে আজ এমনি হাসখৎ লিখে দিলে যে এক পা বাড়াতে গেলেও আজ চাই ওর permission—ছাড়পত্র। এই হোলো ওর মুক্তির সাধনা। গেলো দেশ, রইলো ওর কাল্পনিক স্বার্থ—সেই হোলো ওর বড়ো। আমিও অনেক পড়েচি, অনেক দেখেচি, অনেক কিছু করেচি—এ কথা আমিও তো ভুল্‌তে পারি নে। তাই, যে যা বলে মেনে নিতে পারি নে, আমার বাধে। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা নিষ্ফল। আমার ছেলেবেলার একটা কথা চিরদিন মনে থাকবে। মামার সঙ্গে স্যর গুরুদাসের বাড়ী দুর্গাপূজোর নেমন্তন্ন খেতে গেছি। গিয়ে দেখি গুরুদাসের প্রচণ্ড ক্রোধে মাথার বড় বড় কেশর ফুলে উঠেচে। একজন ছাত্র নাকি বলেছিল গঙ্গাস্নানে পাপ ক্ষয় হয় সে বিশ্বাস করে না। গুরুদাস ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে বল্‌চেন যে, স্নানের প্রয়োজন নেই, শুধু তীরে দাঁড়িয়ে গঙ্গা বলে গঙ্গা দর্শন করলে শুধু তার নিজের নয় সাত পুরুষ যে পাপমুক্ত হয়ে অক্ষয় স্বর্গবাস করে এতে সন্দেহের অবকাশ কোন্‌খানে? কোন্ পাষণ্ড এ শাস্ত্রবাক্য অস্বীকার করতে পারে! বল্‌তে বল্‌তে তিনি রাগে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। মনে আছে সেই ছেলে বয়সেই মনে মনে বোললাম এই গুরুদাস। সেকালের এম. এ-তে Mathematicsএ first, বড় উকিল, বড় jurist, বড় জজ, Universityর ভাইস চ্যান্‌সেলার! ধার্মিক, সত্যবাদী—তিনি ভণ্ডামি করেন নি, যা সত্য ব'লে বিশ্বাস করতেন তাই বলেছেন,—তাই এই ভীষণ ক্রোধ। দেখি এ নিয়ে Sir Oliver Lodgeএর সঙ্গেও তর্ক চলে না, আমার প্রজা গৌর মাঝির সঙ্গেও না। এ অন্ধ বিশ্বাস। তাকেই নানা যুক্তি, নানা কথায় মার প্যাঁচ লাগিয়ে সত্যি বলে মেনে নেওয়া। বিদ্যে-সিদ্ধে থাকলে কথায়-বার্ত্তায় রঙ চঙ্ লাগাতে পারে, না থাক্‌লে সোজা কথায় সহজ কোরে বলে। প্রভেদ ঐটুকু। ঐ Sir Gooroodas! তোমার কাছে এ সব বলতেও ভয় হয়, কারণ, সকলেই জানে যে আশ্রম-বাসীরা অত্যন্ত ক্রোধী হয়। তারা কথায় কথায় গাল-মন্দ ক'রে তেড়ে মারতে আসে।···

···কোন আশ্রমের পরেই আমি প্রসন্ন নই, কিন্তু কোন-একটা বিশেষ আশ্রমের পরেই আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ বা আক্রোশ নেই। আমি জানি ও সবই সমান। সবই ভুয়ো।

আশ্রম যাক্,···আসল কথা তুমি নিজে। তোমাকে যে অত্যন্ত স্নেহ করি এ মিথ্যে নয়। ভারি দেখতে ইচ্ছে হয়। গান শুন্‌তে গল্প করতে। ভারি বুড়ো হয়ে পড়েচি, আর কটা দিনই বা বাঁচবো, এ দিকে আসবে না একবার? ইতি ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩৭। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মৃগ-তৃষ্ণিকা

১

প্রগাঢ় সম্পদ-তৃষ্ণা উচ্চকিত করেছে জীবন
অকস্মাৎ প্রিয়তম! রিক্ততার তিক্ত অবসাদ
আচ্ছন্ন করেছে যত অনুভূতি। অসন্তুষ্ট মন···
ক্ষুব্ধ নেত্রে ভেসে যায় ঐশ্বর্যের কামনা অগাধ।
এ ভুবনে প্রকৃতির সৌন্দর্যের কত আয়োজন—
সামান্যের প্রয়োজনে অসামান্য প্রাচুর্যের ঘটা,
একটি পুষ্পের জন্য লক্ষকোটি বীজের সৃজন—
অঙ্কুরের প্রত্যাশায় নভোব্যাপী সূর্যালোকচ্ছটা।
আমার দারিদ্র্য-দুঃখে লজ্জা পায় গর্বিত মিলন,
অপমানে কেঁদে যায় সম্ভোগের সহস্র প্রত্যাশা,
অনাদরে লীন হয়,—ব্যর্থতায় হৃত আভরণ
অপ্রশস্ত পরিসরে বিকাশ-উন্মুখ ভালবাসা।
যে নারী কুণ্ঠিতপদে দিনশেষে মাটির কুটিরে
মিলনের শয্যা পাতে প্রদীপের স্তিমিত শিখায়,
ভীরু বসনের তলে সীমাবদ্ধ বাসনার তীরে
অস্পষ্ট প্রেমের পায়ে নতনেত্রে নিজেকে বিকায়,—
সে রমণী আমি নই। আমি চাই অকুণ্ঠ অন্তর—
মহান প্রেমের তরে সুমহান যোগ্য অবসর।

২

মনে আসে পুরাতন কাব্যগ্রন্থে পঠিত কাহিনী—
স্খলিত-প্রহর-দিবা-অভিসার স্বাধীনা নারীর,—
একক বান্ধব সঙ্গী ঘনকাল উদ্দাম বাহিনী···
গর্ভিণীর ম্লানশোভা ধারাক্রান্ত ক্লান্ত পৃথিবীর।
বৃষ্টিহত দহুরের পঙ্ক-ক্লিন্ন ব্যাদিত বদন,—
দীপান্বিত নীপশাখে শিখীব্যূহ মদন-আতুর,—
বলাকার শল্যবিদ্ধ মেঘে মেঘে তড়িৎগর্জন,
সদ্য-ক্ষিতিগন্ধ-মত্ত মহিষেরা বর্ষণ-বিধুর।—
রূপে রসে রোমাঞ্চিত ধরণীর মণিময়ী শোভা,
বিদ্যুৎ-পতাকা-দীপ্ত প্রাবৃটের প্রবেশ-ঘোষণা,

সম্যক্-সম্ভোগ-লুব্ধ কামীদের দীপ্ত মুখপ্রভা—
পঞ্চশর-সম্রাটের করে শুধু আদেশ-দ্যোতনা।
কে সে? কার অঙ্গশোভা অনঙ্গের উদ্যত সন্ধান
অনুগত প্রিয়সার্থে অলজ্জিত হৃদয়-তোরণ,
চকিত দংশনে যবে জল-আর্দ্র ওষ্ঠ মথমান—
সর্ব-অঙ্গে ঝলসায় বহ্নিময় রক্ত-আভরণ।
মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের সম্মিলিত শ্রেষ্ঠ-নিয়োজনে
প্রেমমুগ্ধ কে সে নারী আমন্ত্রণ করে প্রিয়জনে?

৩

জানি আমি সেই নারী,—মুখচ্ছবি হৃদয়-দর্পণে
বার বার ফেলে গেছে। বার বার তারি দীর্ঘচ্ছায়া
আমারে করেছে স্পর্শ, পদধ্বনি ক্লান্ত বিসর্পণে
অমর বিপাকে তারি বেষ্টন করেছে মর-কায়া।
কখনো করেছে রুদ্ধ সে আমার কালিকপ্রবাহ
এনেছে বৈফল্য শুধু সাধারণ সহজ জীবনে,
বেদনার নিশামুখে সে এনেছে দিনান্ত-প্রদাহ,
সন্ধ্যার আরক্ত-আভা অকস্মাৎ চিত্ত-বিদারণে।
এই প্রকৃতির মাঝে সেই শক্তি নিয়ত স্ফরিত,
সামান্যকে অসামান্য সেই তো করেছে বহুরূপে,
তুচ্ছ-জীব-জনমের প্রয়োজনে সৌন্দর্য অমিত—
গোপন ফল্গুর মত সঞ্চার করেছে চুপে চুপে।
সর্বদেহ পুণ্যবান তারি পুণ্যপদের স্পর্শনে,
গর্বিত ঐশ্বর্যে তার সার্থক সকল অবদান,
সর্ব-অণু-উৎকণ্ঠিত ক্ষণমাত্র দুর্লক্ষ্য দর্শনে
দুর্লভ আশ্বাসে তার চিরকাল আশংসিত প্রাণ।
জানি আমি সেই নারী, সে আমায় করেছে চকিত,
আমার বাসনা মাঝে তারি জয় হয়েছে ঘোষিত।

৪

আঁধার খনির তলে মাণিক্যের আরক্ত দ্যুতির—
কে করে মহিমা-স্তব? মৃত্তিকা ও প্রস্তর মিশ্রিত—

রক্তে শুধু অবসাদ—অন্ধকারে সংস্কার-চ্যুতির।
কে শোনে রোদনধ্বনি নিশীথের বেদনা-নিস্থত।
মনে হ'ত একদিন—নগরীর বিশাল ছায়ায়—
স্তিমিত আলোর তলে সুগোপন একটি কক্ষের—
পরিসর মুক্তি দেবে আমাদের প্রেম মহিমায়,—
ধন্য হবে আশাগুলি ব্যক্ত হয়ে প্রমুক্ত বক্ষের।
ছি ছি—এ কি লজ্জা তবু—দারিদ্র্যের নখর-আঘাতে
ব্যথিত রাত্রির বক্ষে জ্বলে স্বল্প আলোকের ক্ষত,—
ছিন্ন সাজ ভগ্ন শয্যা—কেঁদে ওঠে প্রখর প্রভাতে,
স্খলিত হৃদয়-গ্রন্থি অকস্মাৎ শাসন-সংহত।
মনে হয় সব ব্যর্থ, সব কিছু মিথ্যা বা বিভ্রম,
সোনার বাসনাগুলি নির্যাতিত লৌহের বন্ধনে,
ধরণীর ধূলিপুঞ্জ নভসূর্য করে অতিক্রম—
সঙ্গীতের সুরগুলি স্তব্ধ হয় স্তিমিত ক্রন্দনে।
যে রবি মধ্যাহ্ন-চারী আকাশের দীপ্ত-সিংহাসনে,
সে কেন সমাপ্তি পায় অন্ধকারে সায়াহ্ন-ভাবণে?

৫

অর্থকে করেছে ঘৃণা এতকাল বিদগ্ধ-সজ্জন—
সহায় হয়েছে তার সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা।—
বিধিনিষেধের জালবদ্ধ হয়ে অবসন্ন মন—
এতকাল যা খুঁজেছে হয়েছে কি সার্থক আজো তা?
শতসাধ-স্বপ্ন-আশা সময়ের পিচ্ছিল সোপানে
স্খলিত হয়েছে মুহু। সাফল্যের শত সম্ভাবনা
স্বর্ণমায়ামৃগ-ফাঁদে বৈকল্যের কী বেদনা আনে?—
প্রেয়সিকে তপোভঙ্গে অকস্মাৎ কাঁদে কি সাধনা?—
এ ভুবনে প্রকৃতির সৌন্দর্যের কত আয়োজন!—
সামান্যের প্রয়োজনে অসামান্য প্রাচুর্যের ঘটা!—
একটি পুষ্পের তরে লক্ষকোটি বীজের সৃজন—
অঙ্কুরের প্রত্যাশায় নভোব্যাপী সূর্যালোকচ্ছটা।
মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের যুগ্ম মধু স্বর্ণের বন্ধনে
কে করেছে নিয়োজিত ময়দেহে অমর বাসনা?

দুর্লক্ষ্যের তৃষ্ণিকায় হয় নি যা সহজ জীবনে
তারি মাঝে এসেছে কি পৃথিবীর সুখ-সম্ভাবনা?
আমার প্রেমের স্বপ্নে ব্যাপ্ত জানি এ বিশ্বভুবন—
তাই তো অমর স্বপ্নে ময়দেহে রক্ত-উদ্ভাসন।

উমা দেবী

ভ্রষ্ট লগ্ন

শঙ্খ কুড়ানো ছেলে। সে যখন মাতৃগর্ভে, তখন তার বাপ মারা যায়, শঙ্খকে ভূমির হাতে সমর্পণ ক'রে তার মাও পতির অনুগমন করে। আপন বলতে গ্রামে তার কেউ ছিল না। এই অনাথ কৈবর্ত-শিশুটিকে নিয়ে কি করা যায়, এই চিন্তায় গ্রামের মুরুব্বিদের মাথার ঘাম পায়ে ঝ'রে পড়তে থাকে।

অস্পৃশ্য জাতির একটি সদ্যোজাত শিশু; তবু তো কৃষ্ণের জীব। যে ক'রেই হোক তাকে বাঁচাতে হবে তো! কিন্তু বাঁচাবার উপায় উদ্ভাবন হয় না। গ্রামে দু-চার ঘর কৈবর্ত যে না আছে তা নয়, কিন্তু তাদের ঘরে পালে পালে ছেলেমেয়ে; সেগুলোকেই খেতে পরতে দিতে পারে না, পরের ছেলের বোঝা বইতে তাদের দায় পড়েছে। কারও যে একটু উপকার করবে সে মতিবুদ্ধি তো এদের নেই, ছোটলোক আর কাকে বলে?

সকল সমস্যার সমাধান ক'রে দেয় নিবারণ ভট্টাচার্যের স্ত্রী বিনতা। ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে কয়েক ঘণ্টা বয়সের কৈবর্ত-শিশুটি মুখে আঙুল পুরে কাঁদছিল, নিঃসঙ্কোচে বিনতা তাকে বুকে ক'রে ঘরে নিয়ে আসে।

ব্রাহ্মণগণ, যাঁরা গ্রাম্য সমাজের মুরুব্বি, তাঁদের বিস্ময় আর ক্রোধের সীমা থাকে না। কৈবর্তের ঘরের এক যোঁটা একটা ছেলে আঁতুড়েই যদি চোখ বোজে; তাতে জগতের এমনই কি লোকসান? সেজন্য ব্রাহ্মণের মর্যাদা বিসর্জন দিতে হবে? চারপোয়া কলি পূর্ণ হতে আর বাকি কি?

সমস্ত গ্রামবাসীর ধিক্কারেও বিনতা বিচলিত হয় না। তার বয়স ত্রিশের উপরে, এখনও সে নিঃসন্তান। সমস্ত অন্তর মাতৃত্বের বুভুক্ষায় লালায়িত হয়ে উঠেছিল তার। শঙ্খকে বুকে নিয়ে সে যেন সার্থক হয়, পূর্ণ হয়। ওই একরত্তি শিশু তার শূন্য ঘর ভরপুর ক'রে তোলে। নিরীহ নির্বিরোধী নিবারণ ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত মতামত বড় একটা ছিল না, সুতরাং উভয় পক্ষের মতামতের মাঝখানে প'ড়ে সে বেচারা হাঁপিয়ে ওঠে, আর গৃহকোণ আশ্রয় ক'রে নিজেকে সকলের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রাখে।

গ্রামবাসী উচ্চবর্ণের সকলেই বিনতার কাজে বাধা দেয়। কিন্তু সঙ্কীর্ণ সমাজের

চোখরাঙানিকে ভয় করে না সে। একঘরে হ'লেই বা তার ভয় কিসের? তার তো আর পাঁচটা ছেলেমেয়ে নেই যে, তাদের জন্য সমাজ মেনে চলতে হবে!

বিনতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না; কিন্তু সে শঙ্খের জন্য রূপার ঝিনুক-বাটি গড়িয়ে আনে, ভাল ভাল জামা জুতো পরিয়ে তাকে ধনীর ছেলের মতন ক'রে মানুষ ক'রে তোলে।

দু বছর পর অপ্রত্যাশিতভাবে বিনতার একটি কন্যা-সন্তান জন্মে। সমস্ত বিদ্বেষ ভুলে গ্রামের লোক তার বাড়িতে এসে আনন্দ প্রকাশ করে। অযাচিত উপদেশ বর্ষিত হতে থাকে। ভগবান দয়া ক'রে তার শূন্য কোল পূর্ণ করেছেন, ছোটজাতের ছেলেটাকে আর তার কিসের দরকার? ওটাকে এখন দূর ক'রে দিলেই হয়। ওর জাতের কেউ যদি ওর ভার না নেয়, ফেলে রেখে এলেই হবে কোনও অনাথ আশ্রমে। এখনও ওই ছেলেটাকে ঘরে পুষলে দেবতা অপ্রসন্ন হবেন। কারণ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্যই দেবতা এই দয়া করেছেন, নয়তো বন্ধ্যা নারীর সন্তান হতে কে কবে দেখেছে? অকৃতজ্ঞ হওয়া মহাপাপ, দয়াময়ের করুণা স্মরণ ক'রেও বিনতার ওকে দূর ক'রে দেওয়া উচিত।

মেয়েটি কোলে শুয়ে স্তন্যপান করে, কাঁধ ধ'রে দাঁড়িয়ে শঙ্খ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে 'ভাই'।

বিনতার চোখ ছলছল করে। দূর ক'রে দিতে বললেই কি দূর ক'রে দেওয়া যায়? মাতৃত্বের ক্ষুধায় যেদিন তার সমস্ত অন্তর ক্ষুধিত হয়ে উঠেছিল, এই শিশুই সেদিন তার সে ক্ষুধা মিটিয়েছিল। যে একদিন সন্তানের স্থান পূর্ণ করেছিল, তাকে আজ দূর ক'রে দেবে সে কোন্ প্রাণে?

মা ষষ্ঠী এতদিনে প্রসন্ন হলেন, পাঁচ বছরের মধ্যে বিনতার আরও দুটি মেয়ে হ'ল। কিন্তু শঙ্খের জন্য তার অন্তরে যে স্নেহ সঞ্চিত হয়েছিল, তার বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না। তবে এখন তার তিন-তিনটি মেয়ে জন্মেছে, গ্রাম্য শাসন অবহেলা করবার সাহস তার নাই। তাই শঙ্খকে না বুঝতে দিয়ে যতদূর সম্ভব তার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করে, আর কয়েকটি বামুন খাইয়ে যথারীতি প্রায়শ্চিত্তও তার করতে হয়েছে।

শঙ্খ তখন স্কুলে ভর্তি হয়েছে। তার সহপাঠীগণ আর গ্রামের হিতৈষীগণ তার অবস্থা তাকে বোঝাবার জন্য বিশদরূপে চেষ্টা করে। বিনতার কোলে মাথা গুঁজে শঙ্খ কাঁদে, বলে, মা, ওরা বলে, তুমি নাকি আমার মা নও? তুমি নাকি আমাকে কুড়িয়ে পেয়েছ? তার সঙ্গে সঙ্গে বিনতাও কাঁদে, ওরা বড় মিছে কথা বলে শঙ্খ।

শঙ্খের ম্লান মুখে হাসি ফুটে ওঠে; কিন্তু বিনতার প্রাণ হাহাকার করে। সমাজের নিষ্পেষণ থেকে সে তাকে রক্ষা করবে কেমন ক'রে? সে শক্তি তার কোথায়?

মেয়ে তিনটি বেশ বড় হয়ে ওঠে, ম্যাট্রিক পাস ক'রে শঙ্খ শহরে গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়, সেই সময় পরপার থেকে নিবারণ ভট্টাচার্যের ডাক আসে। যে আয় দিয়ে কোনমতে সংসার চলত, তাও বন্ধ হয়ে যায়। পড়া ছেড়ে দিয়ে শঙ্খ কাজ করে, মাসান্তে সামান্য কয়টা টাকা এনে বিনতার হাতে দেয়, কায়ক্লেশে সংসার চলে।

সূর্য উদয় হয়, অস্ত যায়; সঙ্গে সঙ্গে বয়স বাড়ে। বড় মেয়ে নীপা বেশ বড় হয়ে ওঠে। মেয়ের দিকে চেয়ে বিনতার উৎকণ্ঠা বাড়ে। মেয়ের রূপ গুণ থাকা সত্ত্বেও বিয়ে হয় না, সব প্রস্তাবই শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়।

অতীত জীবনে ব্রাহ্মণ-সমাজের অনুরোধ ও আদেশ উপেক্ষা ক'রে বিনতা যে একটি নীচজাতি শিশুর জীবন রক্ষা করেছে, এ অপমান তারা এখনও ভুলতে পারে না। একজন দরিদ্র অশিক্ষিতা গ্রাম্যরমণী, কুসংস্কারের সংকীর্ণ গণ্ডি ডিঙিয়ে, দয়াদাক্ষিণ্যে তাদের চেয়ে মহৎ হয়ে দেখা দিল, ব্রাহ্মণের জাতিনাশের গ্লানি অপেক্ষা পরাভবের এই গ্লানিই তাদের কাছে বৃহত্তর হয়ে দেখা দিয়েছে। দয়া কি তারাও করতে জানে না? কিন্তু তারও তো পাত্রাপাত্র বিচার করা চাই! যারা উচ্চবর্ণের সুখ-সৌভাগ্যের উচ্ছিষ্ট ভোগের জন্যই জন্মেছে, ঠাকুরের ভোগের অন্ন তারই সম্মুখে ধ'রে দেওয়া হবে? এত দুর্বুদ্ধি তাদের নেই। সমস্ত মুরুব্বির আদেশ যে অবহেলা করে, সমাজের বুকে যে পদাঘাত করে, তারই হ'ল জয়? আর সেই নিম্নবর্ণের অখ্যাত বালকটিই উদারতা-মহত্ত্বে খ্যাত হয়ে উঠছে? ধ্বংসোন্মুখ পরিবারকে অন্নজল দিয়ে সেই রাখছে বাঁচিয়ে? স্নেহ মমতা আর কৃতজ্ঞতার এই মাধুর্যময় সমাবেশ তারা সহ্য করতে পারে না। সেই অম্লান পরিবেশের গায়ে কলঙ্কের কালি ছিটিয়ে দিয়ে তৃপ্তি লাভ করে। ফলে নীপার বিয়ে হওয়া দুরূহ হয়ে ওঠে।

ছুটির দিনে শঙ্খ ঘরে শুয়ে একখানা বই পড়ে; বিনতা এসে কাছে বসে। শঙ্খ বইখানা মুড়ে মার মুখের দিকে তাকায়।

তোমার খাওয়া হয়েছে মা?

না বাবা, আজ একাদশী। কি বলতে গিয়েও থেমে যায় সে, তার পরেই সহসা ব'লে ফেলে, নীপাকে তুই বিয়ে কর্ বাবা! শুনতে ভুল করেছে ভেবে বিনতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে শঙ্খ।

বিনতা পুনরুচ্চারণ করে, নীপাকে তুই বিয়ে কর্ শঙ্খ। বিহ্বলভাবে শঙ্খ বলে, এ তুমি কি বলছ মা?

না ব'লে কি করব বাবা? নইলে মেয়েটার যে গতি হয় না শঙ্খ।

শঙ্খ প্রবলভাবে মাথা নাড়ে, সে হয় না মা। নীপা আমার ছোট বোন, চিরদিন

তাই জেনে এসেছি। এ কথা তো আমি ভাবতেও পারি নে। তা ছাড়া আমার হাতে তাকে দিতে চাইছ কেন মা? কি আছে আমার? আমি অশুচি—

বাধা দিয়ে বিনতা বলে, তোকে যেদিন কোলে তুলে নিয়েছি শঙ্খ, শুচি-অশুচির প্রশ্ন আমার সেইদিনই ঘুচে গেছে। অন্তরের শুচিতাই মানুষকে শুচি করে, এই আমি জানি। নীপা যদি তোর মত স্বামী পায়, সে তার মহাভাগ্য। তা ছাড়া তার বিয়ে দেওয়াই যে অসাধ্য হয়ে পড়েছে রে!

শঙ্খ মাথা নীচু ক'রে থাকে। এই দুর্ভাগ্যকে অঙ্কে স্থান দিয়ে এই স্নেহময়ী রমণীর যে লাঞ্ছনার সীমা ছিল না, তা সে জানে। কিন্তু প্রতিকারের উপায় কি? জ্ঞান-লাভের পর থেকে কতবার সে ভেবেছে যে দূরে চ'লে যাবে, কিন্তু একান্ত স্নেহপরায়ণা এই সরলা নারীর অন্তরে সে যে কতবড় শেল হয়ে বিঁধবে, তাও তো সে জানে। তা ছাড়া অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য ক'রেও যাঁরা তাকে জন্মক্ষণ থেকে সুখের নীড়ে লালন ক'রে বড় ক'রে তুলেছেন, সেই সহায়সম্পদহীন দুঃস্থ পরিবারকে ফেলে চ'লেই বা সে যাবে কেমন ক'রে? এতবড় অকৃতজ্ঞকে তা হ'লে বিধাতা ক্ষমা করবেন না।

অবশেষে নীপার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। বিদেশী বর, গ্রামের দলাদলির খবর রাখে না। বর লেখাপড়া জানে, বিদেশে চাকরি করে, ছুটি নিয়ে এসেছে, বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে কর্মস্থলে চ'লে যাবে।

বিনতা ও শঙ্খ সাধ্যমত বিয়ের আয়োজন করে। অধিবাস হয়ে যায়, সন্ধ্যালগ্নেই বিয়ে। বর বেলাবেলিই এসে পৌঁছে যায়।

কনেচন্দন, লাল চেলি আর সামান্য দু-একখানা অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে লজ্জানত মুখে ব'সে ছিল নীপা। সহসা কোলাহল শোনা গেল যে, বর এ মেয়েকে বিয়ে করবে না, সে কাউকে না জানিয়ে চ'লে গেছে।

কেঁদে আকুল হয় বিনতা; হিতৈষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে; শত্রুরা প্রকাশ্যে হাসি-বিদ্রূপে তাদের দুঃখ বাড়িয়ে তোলে।

গরমের ছুটিতে কয়েকটি কলেজের ছেলে গ্রামে সমবেত হয়েছিল; সব শুনে তারা জামার আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে আসে। এতবড় দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের সঙ্গে যে নীপার বিয়ে হয় নি, এ যে তার কত বড় সৌভাগ্য, সে কথা ব'লে বিনতাকে সান্ত্বনা দেয়। তারপর সুপাত্রের খোঁজে তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে; শেষরাত্রে একটা লগ্ন আছে, সেই লগ্নে বিয়ে তারা দেবেই।

বিয়ের আসরের আলো নিবে গেছে। কেঁদে কেঁদে ঘরের মেঝেতে বিনতা ঘুমিয়ে পড়েছে। নীতা, নীলা উৎসবভঙ্গের ক্ষোভে শয্যার আশ্রয় নিয়েছে।

সেই শূন্য আসরে দাঁড়িয়ে আছে শঙ্খ। গভীর অন্ধকার; আকাশ তারায় তারায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আঙিনার এক পাশে এক ঝাড় রজনীগন্ধা উদারভাবে গন্ধ বিলায়। চরাচর নিদ্রিত; শুধু ঝিঁঝিঁপোকার চোখে ঘুম নেই, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তারা ডেকেই চলেছে। গুমোট গরম, সহসা এক ঝলক শীতল বাতাস ছেলেমানুষের মত তার সর্বদেহে স্পর্শ বুলিয়ে দেয়।

হঠাৎ চুড়ি আর চাবির শব্দে শঙ্খ চমকে ওঠে। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে নীপা। আজ সেই তুচ্ছ প্রসাধনেই সে কি অপরূপ হয়ে উঠেছিল! মিথ্যা কলঙ্কে কালিমাময়ী অনাদৃতা নারী! অন্ধকারে নীপার মুখ দেখা যায় না, তবু তার ম্লান মুখ কল্পনা ক'রে শঙ্খের চোখে জল আসে। সস্নেহে বলে, উঠে এলি কেন নীপা, শুয়ে থাক্‌গে যা।

নীপা হঠাৎ তার পায়ের কাছে ব'সে পড়ে।

আমাকে এ অপমান থেকে বাঁচাও শঙ্খদা!

শঙ্খ তার পিঠের উপর হাত রাখে। আমার সাধ্য থাকলে তোর এত অপমান কি মুখ বুজে সইতাম নীপা?

তোমারই সাধ্য আছে শঙ্খদা, আর কারও নেই।—ব'লেই একটু থেমে মনের সঙ্গে কি যেন বোঝাপড়া করে। তারপর সহসা ব'লে ওঠে, তুমি আমায় বিয়ে কর শঙ্খদা। সমস্ত অপমান থেকে আমাকে বাঁচতে হ'লে এ ছাড়া আর কি পথ আছে বল তো?

শঙ্খের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। এই যে নক্ষত্রখচিত অসীম নীলাকাশের ছায়াতলে স্তব্ধ ঘুমন্ত পৃথিবী, এ কি সত্যি, না মিথ্যে? ওই যে সন্ধ্যামালতীর তন্দ্রাতুর দুটি পাতার উপরে দুটি জোনাকি জ্বলছে, এই যে রজনীগন্ধার সুগন্ধের আমন্ত্রণ, এ সবই কি সত্যি? অথবা ভ্রান্তি?

হঠাৎ শঙ্খ হেসে ওঠে, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি নীপা? আবোল-তাবোল বকছিস?

শঙ্খের পরিহাসে নীপার কণ্ঠ প্রখর হয়ে ওঠে। এখনও প্রকৃতিস্থ আছি, কিন্তু এর পর হয়তো থাকব না।

শঙ্খ জোর ক'রে হাসতে চায়, কেন বিয়ে হ'ল না ব'লে? বিধাতা যা করেন মঙ্গলের জন্য। ও লোকটা একেবারে ইতর, ওর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে ভালই হ'ল। ওরা পাত্রের খোঁজে বেরিয়েছে, শেষরাত্রে একটা লগ্ন আছে।

শেষরাত্রের কত দেরি বোঝবার জন্য শঙ্খ আকাশ নিরীক্ষণ করে।

লক্ষ্মী দিদি আমার! দুঃখু করিস নে, শুয়ে থাক্‌গে যা—

নীপা বলে, ভেবো না যে বিয়ের দুঃখে ম'রে যাচ্ছি। তোমার কাছে বিধাতার মহিমার কথাও শুনতে আসি নি। তোমার উপদেশ আর সান্ত্বনা শুনতে আমার ব'য়ে গেছে। আমি যা বলছি, করবে কি না স্পষ্ট ক'রে বল।

এবার শঙ্খ হাসতে পারে না, বলে, ভাইয়ে বোনে বিয়ে হয়, কখনও শুনেছিস নীপা?

আমার কথা একটু ভাবো শঙ্খদা, তোমার নামের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে যে কুৎসা রটনা হচ্ছে, তারপরে আবার আজকের ব্যাপার, কাল সূর্যের আলোয় আমি মুখ বার করব কেমন ক'রে? সহসা কেঁদে ফেলে সে। এ অপমান থেকে একমাত্র তুমিই আমাকে বাঁচাতে পার শঙ্খদা।

শঙ্খ বলে, কাঁদিস কেন নীপা? তুই নির্দোষ, নিন্দুকের রসনাকে তোর অত ভয় কিসের? সেই ভয়ে একটা প্রচণ্ড মিথ্যাকে তুই সত্যি ক'রে তুলবি? সে হয় না নীপা, জ্ঞানের পর থেকেই তোকে বোন ব'লে জানি; সে সম্পর্ক, সে স্নেহের সম্পদ ধূলায় লুটিয়ে দেব, অত শক্তি আমার নেই বোন।

নীপা উঠে নিঃশব্দে ঘরে চ'লে যায়। সেই নিরানন্দ বিবাহ-আসরে ততোধিক নিরানন্দ চিত্তে ব'সে থাকে নিঃসঙ্গ শঙ্খ।

প্রভাতের নির্মল আলোকে নীপার অপমানপীড়িত মলিন মুখ দেখতে হবে, এই ভয়ে পূর্বদিকে উষার আভাসের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ দ্রুতপদে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

যারা পাত্রের খোঁজে গিয়েছিল, প্রভাতে তারা ফিরে আসে। পাশের গ্রামের একজন শিক্ষিত উদার যুবক এই লাঞ্ছিতা মেয়েটিকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু তার পিতা গেছেন স্থানান্তরে; তাঁকে আনবার জন্ত লোক গেছে। ছেলেটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, পিতাকে সম্মত করিয়ে আজ রাত্রের লগ্নে সে নিশ্চয়ই এই মেয়েকে বিয়ে করবে। সন্ধ্যার আগেই বরযাত্রী এসে পৌঁছবে, দুর্ভাবনার কোনও কারণ নেই।

বিনতার বিরস মুখে আবার হাসি দেখা দেয়, আজিনার নষ্ট আলপনা উদ্ধারে মনোনিবেশ করে সে। কি কি উপায়ে নতুন জামাইকে বোকা বানানো যেতে পারে, নীতা নীলা সেই সব উপায় সংগ্রহে উৎসাহী হয়।

কিন্তু প্রতীক্ষার অবসান হয়। সন্ধ্যার লগ্ন ব'য়ে যায়, বর আসে না, আসে বার্তাবহ। এ মেয়ে বিয়ে করলে বাপ ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করবে ব'লে ভয় দেখিয়েছে। ছেলেটিও হঠাৎ সুপুত্র ব'নে গেছে; ভাবপ্রবণতা যেটুকু মনে সঞ্চয় হয়েছিল, সেটুকু বাপের তাড়া খেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিয়ে করতে সে অক্ষম, বার্তাবহ মারফৎ এ বার্তা সে বিনয় ক'রে জানিয়ে দিয়েছে।

কলেজের ছেলেগুলো আবার আস্তিন গুটায়, আবার আস্ফালন করে, কিন্তু সাহস ক'রে পাত্রের সন্ধানে বার হয় না। ঘরে ব'সে সমাজসংস্কার বিষয়ে গরম গরম বক্তৃতা করে।

বিনতার শুষ্ক চোখে আবার জল ঝরে। নীলা, নীতা দিদির কাছে ব'সে ঘুমে ঢুলে ঢুলে অবশেষে শুয়ে পড়ে।

আলপনা আঁকা পিঁড়িতে স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে নীপা। তার জীবনের উপর দিয়ে

যে ঝড় ব'য়ে গেছে, তার শান্ত মুখে তার চিহ্নমাত্র নেই। মেয়ের কাছে এসে মাথার উপর হাত রেখে কেঁদে ওঠে বিনতা। চোখের জল যখন তার ফুরিয়ে এল, স্তব্ধতায় সারাবাড়ি তখন থমথম করছে।

অন্ধকার বিয়ের আসরে আজও শঙ্খ একাকী দাঁড়িয়ে ছিল। কোথা থেকে আকাশে একদল মেঘ এসে জুটেছে, তাদের আনাগোনায় বিরাম নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো ঠিকরে পড়ে, মাঝে মাঝে মৃদু গর্জন করে মেঘ। টপটপ ক'রে দু-চার ফোঁটা বৃষ্টিও এসে তার তপ্ত ললাট স্পর্শ করে।

সহসা অন্তরে বেদনাময় একটা তীক্ষ্ণ আনন্দ অনুভব করে শঙ্খ। গত রজনীর নিবিড় অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে একটি নিরুপায় নারী একান্তভাবে তাকেই আত্মসমর্পণ করতে এসেছিল। অন্ধকারে সে মুখের অসহায়তা সে দেখতে পায় নি, কিন্তু কণ্ঠ শুনেছিল। সেই করুণ কণ্ঠ যেন সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। বজ্রের আগুনে সে কণ্ঠ শঙ্খের শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রতি রক্তবিন্দুতে আঁকা হয়ে আছে।

সহসা শঙ্খ চমকে ওঠে, চারদিকে তাকায়, কিসের আশঙ্কায় দ্রুতপদে ঘরে গিয়ে দ্বার রুদ্ধ ক'রে দেয়। তবু তার অবাধ্য অন্তর রুদ্ধ দ্বারে কার কম্পিত করাঘাতের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

জানলা দিয়ে বাইরের কালিমাময় ঝোপ-ঝাড়, তরু-লতা চোখে পড়ে। অস্পষ্ট পল্লবের মাথায় মাথায় জোনাকি জ্বলে; বর্ষার আর্দ্র প্রকৃতি যে এত সুন্দর, অন্ধকার যে এত স্নিগ্ধ, তার বাইশ বছরের জীবনে সে কখনও অনুভব করে নি। যৌবন কোন্ সময় তার দেহমনে রাজার আসন পেতে বসেছে, সে তো কিছুই জানে না। যৌবনের স্পর্শ যে অন্তরকে এত মধুময় ক'রে তোলে, এই মুহূর্তে সে কথা সে অনুভব ক'রে শুধু বিস্মিতই নয়, পুলকে কণ্টকিত হয়ে ওঠে। তার অজ্ঞাতসারে তার অন্তরে এত ভালবাসা কবে সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল? এ কি রহস্য!

ধীরে ধীরে তার ক্লান্ত চোখ দুটি ঘুমে ঢুলে পড়ে।

চোখ মুছে বিনতা বলে, ওঠ্, ওগুলো ছেড়ে ফেল্; যেমন কপাল ক'রে এসেছিস!

কই গো ভটাচায্যি-গিন্নী!

পুরোহিতঠাকুর এসে দরজায় দাঁড়ান।

ও পাড়ার পঞ্চানন খুড়ো বিয়ে করতে রাজি আছেন। কিন্তু তুমি কি দেবে?—ব'লেই পুরোহিত বিনতার মুখের দিকে তাকান।

বিস্ময়ে বিনতার মুখ খোলে না। পঞ্চানন চক্রবর্তী তো ঘাটের মড়া! সে-ই বা প্রস্তাব করে কোন্ সাহসে, আর ইনিই বা সে কথা মুখের বার করেন কোন্ লজ্জায়?

পুরোহিত আবার বলেন, তুমি রাজি হ'লে আজ রাত তিনটের লগ্নেই বিয়ে হয়ে যেতে পারে।

বিনতা বলে, বিয়ে না হয় নীপার না-ই হবে, তাই ব'লে বিয়ের নামে ওকে কি জলে ভাসিয়ে দেব?

পুরোহিত পঞ্চাননের টাকা খেয়ে এসেছেন; সুতরাং বিচলিত হ'লে তাঁর বিস্তর ক্ষতি। উদার কণ্ঠে বলেন, আমার আর কি স্বার্থ, বল? তোমাদের জাত যায়, তাই অনেক ব'লে ক'য়ে হাতে পায়ে ধ'রে রাজি করিয়েছি বই তো নয়। কলির ধর্মই এই, কারু উপকার করতে নেই।

সহসা নিজের উপায়হীনতার কথা বিনতার মনে পড়ে। নিশ্বাস ফেলে বলে, আপনি বসুন। শঙ্খকে ডাকি, দেখি, সে কি বলে!

নীপার অস্তিত্ব অনুভূত হয় এতক্ষণ পরে। সে মুখ তুলে বলে, কাউকে ডাকতে হবে না মা। তারপর পুরোহিতের দিকে চেয়ে বলে, তাঁকেই আপনি ডেকে নিয়ে আসুন। এ বিয়েতে আমার খুব মত আছে। আজ রাতে আমার বিয়ে হওয়া চাই-ই, সে যার সঙ্গেই হোক। শিগগির যান, দেরি করবেন না।

পুরোহিত তুষ্ট হন, এই তো বুদ্ধিমতীর মত কথা। এক ফোঁটা মেয়ে যা বোঝে, বুড়ো হয়েও তুমি তা বোঝ না ভটচাযগিন্নী! একেবারে রেগেই আগুন!

নীপা বলে, আমি আপনার কাছে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। কিন্তু আমার কলঙ্কের কথা প্রচার করতে তিনিই তো ছিলেন বেশি উৎসাহী। এখন কি তিনি সমাজচ্যুত হবেন না?

হাসির ভঙ্গীতে মুখখানা বিকৃত ক'রে তোলেন পুরোহিত। হ্যাঃ, ও আবার একটা কথা—তোমার মত ভাল মেয়ে—হ্যাঃ—

যাক, দুর্ভাবনা দূর হ'ল। যান তাঁকে শিগগির ডেকে আনুন।

বিনতা ধমক দিয়ে ওঠে, চুপ কর্ নীপা, তুই কি নিজেই নিজের অভিভাবক নাকি?

নীপা বলে, আমার বাপ নেই, ভাই নেই। আমার আঠারো বছর বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, আমার অভিভাবক আমি নিজেই। তুমি বাধা দিও না মা। চলুন পুরুতঠাকুর, লগ্ন ব'য়ে যাবে।

পুরোহিতের হাত ধ'রে উঠানে নেমে আসে নীপা, অন্ধকারের বুকে শুভ্র আলপনা-রেখা কুন্দফুলের মত ফুটে আছে।

কাল এই অন্ধকারে সমস্ত লজ্জা গোপন ক'রে আত্মরক্ষার জন্য সে এক হৃদয়হীনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে এসেছিল, কিন্তু সে হস্তভরে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

নিমেষে নীপার দেহের রক্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, পরাজয়ের গ্লানিতে তার সমস্ত অন্তর

ভয়ঙ্গারিত হয়ে ওঠে। আত্মসমর্পণের নামে আজ যে সে আত্মহত্যা করতে চলেছে, এই তার মুক্তিপথ, এই তার জয়। কাল যে সময় তার পরাজয় ঘটেছিল, আজ ঠিক সেই সময়েই সে হ'ল সম্পূর্ণ জয়ী। তীক্ষ্ণ একটা প্রতিশোধের নেশা তাকে অভিভূত ক'রে ফেলে।

আসরের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল পঞ্চানন। চঞ্চল চরণে নীপা এসে তার পাশে দাঁড়ায়। দ্বন্দ্ব-দ্বিধার অবসান হোক, এই তার নিয়তি। এই তার বিধিলিপি।

তুমিই তো সম্প্রদান করবে মা? তবে এস। কাজ আরম্ভ করুন পুরুতঠাকুর!

নীপার স্বর শান্ত।

মন্ত্র উচ্চারিত হয়, সাক্ষী থাকে মেঘমণ্ডিত আকাশ আর ধরণীর মূক মৃত্তিকা।

সহসা শঙ্খ এসে দাঁড়ায় এক পাশে। নিদ্রাতুর চোখে সে শুধু মূঢ়ের মত সকলের মুখের দিকে তাকায়।

পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করেন; কেঁদে ওঠে বিনতা। শঙ্খের সম্বিৎ ফিরে আসে।

থামুন, থামুন, বন্ধ করুন মন্ত্রোচ্চারণ।—আর্তনাদ ক'রে ওঠে শঙ্খ। পুরোহিত ভয় পেয়ে থেমে যান। নীপা বলে, না।

ওই শান্ত সংক্ষিপ্ত একটি শব্দ যেন আর্দ্র অন্ধকার রজনীর শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করেন। শঙ্খের উচ্চ কণ্ঠের প্রতিবাদে সে মন্ত্র শোনা যায় না।

কাজ শেষ করুন পুরুতঠাকুর।—নীপার কণ্ঠে আদেশের সুর।

যে কণ্ঠ শঙ্খের চেতনাশক্তিকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে, এ তো সে কণ্ঠ নয়! এ যেন সহসা বজ্রপাত হয়ে চারদিক দগ্ধ ক'রে ফেলতে চায়।

কাল আমি যে ভুল করেছি নীপা, সেটা সংশোধন করতে দাও আমাকে—

কিন্তু সেই অনাদৃত কণ্ঠ অন্ধকারে মাথা কুটতে থাকে, কেউ উত্তর দেয় না।

গাঁটছড়া বেঁধে বর-কনে যখন ঘরে গেল, তখন নবারুণের প্রভায় পূর্বদিক সোনালী হয়ে উঠেছে।

সুরুচি সেন গুপ্তা

সত্যাগ্রহ

মনের মুক্তি সব মুক্তির শেষ—
সেই মুক্তিতে নাহি জাগে যদি দেশ,
কি হবে গোপন হত্যাসাধনা হিংসা-দ্বেষের রূঢ় আরাধনা
সত্যাগ্রহ তাই মানিয়াছি, মানিয়াছি কংগ্রেস।
নির্ভয়ে জাগো, গৌরবে জাগো, আনন্দে জাগো দেশ।

বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট

হাসপাতালে হাঁসফাঁস

কেমন কাটাচ্ছি, জানতে চান তো? বেশ স্বচ্ছন্দে কেটে যাচ্ছে। দিনে তিনবার ক'রে হাসপাতাল আর তিনশো পঁয়ষট্টিবার হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর বাড়ি ছোটাছুটি ক'রে মরছি।

ছেলে মীটিঙে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙে এসেছেন। অক্ষত অবস্থায় বেরিয়েছিলেন, যখন ফিরে এলেন তখন দেখলুম, একটা ঠ্যাং নড়বড় করছে। কি অবস্থা বুঝুন!—বাঙালীর ছেলের একমাত্র ভরসা দুখানি শ্রীচরণ, তার মধ্যে একটিকে একরকম খুইয়ে এল! তাড়া করলে যে ভবিষ্যতে ছুটে পালাবে, তার রক্ষা গয়া! দেখুন দেখি ঝঞ্ঝাট!

তুই গেছিস মীটিঙে, সেখানে চুপ ক'রে গিয়ে একটু দাঁড়া—তার ব'য়ে যাচ্ছে। সকলের শেষে এসে সকলের আগে গিয়ে বসব, আবার সবাই বেরিয়ে যাবার আগে নিজে আগে বেরিয়ে পড়ব। এ কি বদ অভ্যেস বলুন তো? এতটুকু যদি কাণ্ডজ্ঞান আছে! তেমনই হ'ল, ভিড়ের চাপে ল্যাং মেরে দিলে কে তার ঠ্যাঙের রক্ষা সেরে!

বরাবর ব'লে আসছি, ওরে বাপু, ও-রকম করিস নি, একটু ভব্যতা শেখ্, চ্যাংড়ামো করাটাই খুব বীরত্ব প্রকাশ নয়, তা কেবা শোনে কার কথা! বাপ বকছে কি গাধা ডাকছে—সেইটেই ছেলেরা আজ পর্যন্ত আলাদা ক'রে ভাবতে পারলে না, তা আমি কি করি বলুন?

তার ওপর রয়েছেন ওদের মা। কিছু বললেই বলবেন, যত বুড়ো হ'চ্ছ, তত তোমার টিকটিক করা স্বভাব হচ্ছে, ওই জন্যেই তো ছেলেপুলেরা ওই রকম ব্যাদড়া হয়। যেন টিকটিক না ক'রে বাবাজীবনদের তামাক টিকে ধরিয়ে গুড়ুক ফোঁকবার আয়োজন ক'রে দিলেই সব ঠিক হয়, ছেলেপুলেরা ঠাণ্ডা থাকে, প্রায় এই রকম ভাবটা আর কি। সেটা ক'রে উঠতে পারলুম না, তাই মাসখানেক একেবারে চুপচাপ মেরে রইলুম। যা খুশি কর্ বাবা, কিচ্ছু কথাটি কইব না! তার ফল তো হ'ল ওই। তখন ঠ্যাং জোড়াবার জন্যে ডাক্ বাবাকে!

এ কি মলাটের পাতা যে খানিকটা আঠা দিয়ে জুড়ে দোব? হাসপাতালে দিতেই হ'ল। আকাশ-পাতাল ঘুরে বহু লোকের পায়ে ধ'রে তো কোনক্রমে একটা বেড জোগাড় করতেই হেড খারাপ হবার মত হ'ল। ডাক্তারবাবুরা দেখে বললেন, 'এক্স্‌রে' করতে হবে। করা হ'ল। করকরে বত্রিশ টাকা বেরিয়ে গেল। তারপর কতকগুলো ওষুধের ফর্দ দিলেন, ডিসপেন্‌সারির লোকগুলোই হা-রে-রে রে ক'রে কোত্থেকে যে সত্তর-আশি টাকা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল তা বুঝতে পারলুম না। তারপর নার্সকে দাও, মেথরকে

দাও, দরোয়ানকে দাও, এটা আনো, ওটা আনো করতে করতে আরও শ দুয়েক টাকা বেরিয়ে গেল। এ দেশের দ্রষ্টব্য হাসপাতাল কিনা!

যাই হোক, এর ওপর আবার মুশকিল—যখন তখন ফস ক'রে যাওয়া যাবে না, ঘণ্টি দিলে বেরিয়ে আসতে হবে, সে কত রকমের আইনকানুন! তিতিবিরক্ত হয়ে ডাক্তার-বাবুকে একদিন ব'লে ফেললুম, মশাই, এবার একে বাড়ি নিয়ে যাই, বিশেষ তো কিছু হয় নি ব'লে মনে হচ্ছে। তিনি সে কথা শুনে এমন ভাবে আমার মুখের দিকে চাইলেন যে, মনে হ'ল, আর একটু দৃষ্টি স্থায়ী হ'লে আমাকেও বোধ হয় ওই হাসপাতালের একটা বেডে শুয়ে পড়তে হবে।

ফস ক'রে কথাটা ব'লেই ভাবলুম যে, কাজটা হয়তো ভাল করলুম না, রাত্তিরে ছেলেটা একা থাকে, শেষকালে ডাক্তার চটলে হয়তো, সারাতে পারুক না পারুক, গোটাকতক ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে জব্দ করবে, আর নার্স-টার্স ও হয়তো থাকবে না সেদিকে। তারপর ছেলের মুখে শুনলুম যে, এমনই না বললেও কেউ থাকত না। ওদের সব টাইম বাঁধা কিনা!—জলতেষ্টা বা অন্য প্রয়োজনাদি সারবার টাইম বাঁধা আছে। রুগীকে সেই ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হবে, পাঁচ-দশ মিনিট এদিক ওদিক করেছ কি নিজেই বা খুশি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ক'রে যাও।

আবার বুঝে বুঝে আমার ছেলেটির যিনি সেবার ভার পেয়েছিলেন, তিনি একেবারে ভারতের মহিয়সী মহিলা। কি কড়া চোখ মুখ চোয়াল, কোথাও এতটুকু স্যাঁতসেঁতে ভাব নেই। মেয়েমানুষ যে এত খটখটে কি ক'রে হয়, তা তাঁকে না দেখলে বুঝতে পারতুম না। রোগীরা বলে যে, একজন ফোড়া অপারেশন করতে এসেছিল, কিন্তু হঠাৎ সেই নার্সটির শ্রীমুখপঙ্কজ দেখেই তার ফোড়া কেটে গিয়েছিল, তাকে আর টেবিলে শুতে হ'ল না। তিনি, মনে করুন, করছেন আমার ছেলের সেবা। অথচ যেগুলি সত্যিকারের ভাল, যাদের মুখের দিকে রোগীরা রোগ ভুলে খানিকটা চেয়ে থাকে, তারা সেদিকে নেই, বোধ হয় পয়সাওয়ালা রোগীদের ভাগে পড়েছে। অথচ আমার দেখুন বিপদ!

ছেলেকেই বা কি বলি আর অজানা মেয়েছেলেকে ডেকেই বা তার কর্তব্য বোঝাই কি ক'রে? অভ্যেস নেই তো। শেষে গিন্নীকে দেখাতে নিয়ে এলুম, তিনি একটু নার্সকে কর্তব্য বোঝাতে গেলেন। তার উত্তরে সে দু-একটা কড়া কথা শুনিয়ে দিলে। গিন্নীও ছাড়বার পাত্র নন, তিনি আবার তার জবাব দিলেন। উত্তরোত্তর ব্যাপারটা ঘন হয়ে উঠল। আমি তো ব্যাপার দেখে নিরুত্তর; শেষে সত্বর একটা ট্যাক্সি ডেকে কোনমতে পুত্র পরিবার সমেত সোজা হাসপাতাল থেকে নাম কাটিয়ে বাড়ি চ'লে এসে বাঁচি। শেষে কি হাসপাতালে একটা দাঙ্গা বাধিয়ে পুলিস-কেসে পড়ব?

গিন্নীর কি? কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় তা তো জানেন না! আমাকে যে

হাড়ে হাড়ে বুঝতে হচ্ছে। তিনি তো বাড়ি এসে খুব চীৎকার শুরু করলেন, তুমি যে তাড়াতাড়ি আমায় নিয়ে এলে, তা না হ'লে আমি ওকে ওপরওয়ালাদের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে আগাপাস্তলা একবার দেখে নিতুম।

আমি শেষে বললুম, যাক, সংসারে অনেক কিছু ভাল ভাল জিনিস দেখবার আছে, খামকা ওকে দেখে নিয়ে আর কি হবে, তুমি এখন ছেলেপুলেগুলোকে দেখ!

তিনি কথাটা বোধ হয় পছন্দ করলেন না, বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দেখলুম।

দুনিয়াতে আমার আর দেখতে কিছু বাকি রইল না, বুঝলেন? ছেলেপুলেদের কাণ্ড দেখলুম, গিন্নীর মেজাজ দেখলুম, বন্ধু-বান্ধবের ব্যবহার দেখলুম, স্বদেশবাসীর কর্তব্যপরায়ণতা দেখলুম, লোকের পেছনে খামকা লাগার উৎসাহ দেখলুম, নিজেদের শৃঙ্খলা-রক্ষার দুশ্চেষ্টা দেখলুম, লোকের ভদ্রতা দেখলুম, আহাম্মকদের প্রচারের জোরে নামজাদা হতে দেখলুম, দাতব্য চিকিৎসালয়ে দাতাকর্ণদের দেখলুম, শুধু দেখতে পেলুম না আপনাদের দয়াময় করুণার অবতার ভগবানটিকে—যিনি আমায় পেছনে হপ্তায় পর হপ্তা ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে মজা দেখছেন।

একবার দেখা হ'লে শুধু একটি কথা তাঁকে বলব, মশাই, খুব ভদ্দরলোক যা হোক!

শ্রীবিরূপাক্ষ

রাম গল্প

রাম-রাজত্ব এখনও আছে। আমাদের দৃষ্টি কলুষিত বলিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি না। পবিত্র-দৃষ্টি জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি সংগ্রহ করিয়া সুধীবর্গের গোচরে তাহা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে শান্তি পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছিল। সহসা কিন্তু একদিন তিনি শুনিলেন যে, জনৈক দস্যু নাকি তাঁহার রাজ্যে যথেষ্ট লুটপাট করিতেছে, প্রজারা রাজদরবারে নালিশ করিয়াও কোন সুফল পাইতেছে না। তাহাদের নালিশ নাকি গ্রাহ্য বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে না।

তিনি মন্ত্রীকে ডাকিলেন। সমস্ত শুনিয়া মন্ত্রী মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, কই মহারাজ, এরূপ কোনও দস্যুর সংবাদ তো শুনি নাই।

জলদগম্ভীর কণ্ঠে দাশরথী আদেশ করিলেন, অবিলম্বে অনুসন্ধান করুন।

ঈষৎ কাসিয়া মন্ত্রীমহাশয় নতমস্তকে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

...ছয় মাস অতীত হইল। কোন সুরাহা হইল না। লুটপাটের গুজব কানে আসিয়া প্রজা-প্রাণ রাঘবের চিত্তকে ক্রমাগত উদ্বেলিত করিতে লাগিল।

পুনরায় মন্ত্রীকে আহ্বান করিলেন। বস্তুত মন্ত্রীর সাহায্য ব্যতীত কোন প্রকার

রাজনৈতিক পদক্ষেপ করা যে কোনও রাজার পক্ষে অসম্ভবই। জানকীবল্লভের পক্ষে তো বটেই—মন্ত্রীই তাঁহার সব।'

মন্ত্রী, দস্যুর কোনও সংবাদ পাইয়াছেন কি?

এখনও পাই নাই। অনুসন্ধান চলিতেছে।

অনুসন্ধান কতদিন চলিবে?

শীঘ্রই শেষ হইবে আশা করি। দক্ষ কর্মচারীগণের উপর ভার ন্যস্ত করিয়াছি—

একটু তাড়া দিন।

যথা আজ্ঞা, মহারাজ।

ঈষৎ কাসিয়া মন্ত্রী নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

আরও ছয় মাস কাটিল। আরও বহু বেনামী পত্র আসিয়া কৌশল্যানন্দনের প্রজা-বৎসল হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। মন্ত্রীকে পুনরায় আহ্বান করিলেন।

দস্যুর কোনও খবর মিলিল?

অনুসন্ধান চলিতেছে। দক্ষতর রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে।

রঘুমণি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কে এই দস্যু? যে সকল প্রজা তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছে, তাহারাও কেহ দস্যুর নামোল্লেখ করে নাই। দুর্ধর্ষ, দুর্দান্ত, নৃশংস প্রভৃতি নানাবিধ বিশেষণ ব্যবহার করিয়া তাহার দুর্দমনীয়তা পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইয়াছে মাত্র। তা ছাড়া সমস্ত দরখাস্ত বেনামী। নিজেদের নাম দিতেও কেহ সাহস করে নাই। সীতাপতির মনে হইল, তাঁহার রাজ্যে যে শান্তি বিরাজমান তাহা আপাত-শান্তি, একটা মিথ্যা মুখোশ মাত্র। ভিতরে ভিতরে প্রত্যেক প্রজার অন্তরে অশান্তির হলকা বহিতেছে।

দুর্মুখকে আহ্বান করিলেন। দুর্মুখ নতমস্তকে সমস্ত শুনিয়া বলিল, মহারাজ, আমি সব জানি।

জান? কে সেই দস্যু?

ক্ষমা করুন, নাম বলিতে পারিব না।

পারিবে না? কেন?

ক্ষমা করুন আমাকে।

আমার আদেশ, বলিতেই হইবে।

আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু। তাহার নাম আমি কিছুতেই বলিতে পারিব না। তবে নিতান্তই যদি জেদ করেন, দেখাইয়া দিতে পারি।

রাবণারি রাঘব কোষবদ্ধ তরবারি ঈষন্নিষ্কাষিত করিয়া পুনরায় কোষবদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন, বেশ, তাই দাও।

তাহা হইলে আমার সঙ্গে আসুন।

চল।

নগরের প্রান্তে আসিয়া রাজরথ থামিল।

দুর্মুখ সবিনয়ে কহিল, এইবার মহারাজকে পদব্রজে কিঞ্চিৎ কষ্টস্বীকার করিতে হইবে। দস্যু অরণ্যনিবাসী।

বেশ, চল।

বেশ কিছুদূর হাঁটিয়া উভয়ে একটি অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুদূরে গিয়া দুর্মুখ নিম্নকণ্ঠে সন্তর্পণে কহিল, প্রভু, ওই দেখুন, ওই—

দুর্মুখের ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত তর্জনী অনুসরণ করিয়া রামভদ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং দেখিতে পাইবামাত্র কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া পড়িলেন।

বৃক্ষশাখায় বসিয়া ছিলেন স্বয়ং অঞ্জনানন্দন হনুমান। সীতানাথের গদগদ ভাব এখনও কাটে নাই।

"বনফুল"

সংবাদ-সাহিত্য

ধীশক্তি এবং কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা তিলে তিলে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সম্পদ অর্জন করিতে হয়, কয়েকদিনের সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও প্রচারের সাহায্যে অকস্মাৎ একদা এক নির্দিষ্ট দিবসে লুঠতরাজ ও রাহাজানি করিয়া সেই সম্পদ অধিগত করার নাম—"প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" বা ডিরেক্ট অ্যাকশন। বিগত ১৬ আগস্টের পর ডিরেক্ট অ্যাকশনের এইরূপ সংজ্ঞা বহু প্রত্যক্ষদর্শীর মনে জাগিয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন, ইণ্ডিরেক্ট অ্যাকশন বা অপ্রত্যক্ষ সংগ্রামের দ্বারা স্বসমাজকে উন্নীত করার যে অনেক ধকল অল-ইণ্ডিয়া হাইকম্যাণ্ড তাহা অবগত না থাকিলেও বাংলার উর্দুভাষী প্রধানেরা ভালই অবগত আছেন। এই কারণে কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গৃহে ও প্রাঙ্গণে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার পরিবর্তে লুঠতরাজের মাল ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল, আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষিত-অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকদিগকেও হত্যা ও লুঠনে প্ররোচনা দিতে দেখা গিয়াছিল। ভুক্তভোগী ও আঘাত-প্রাপ্তদের ধারণা যাহাই হউক, এই মারাত্মক গৃহযুদ্ধে আমরা একটা ব্যাপার বিস্ময়ের সহিত প্রত্যক্ষ করিলাম যে, সমাজের ঊর্ধ্বতন অংশই পচিয়া সর্বনাশের কারণ হইয়াছে, নিচের দিকে পচন পৌঁছায় নাই—নিরীহ জনসাধারণ শুধু সংসর্গজাত অপরাধে জীবন ও সর্বস্ব ডালি দিয়াছে। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের মত গুণ্ডাশ্রেণীর জীবেরা

উচ্চশ্রেণীর জীবেদের দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহৃত মাত্র হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত অপরাধ এই প্ররোচকদের—যাহারা অপরের গজ-বোড়ের চালের সুদীর্ঘ সাধনার উপর উপর-চাল দিয়া সস্তায় কিস্তি মাত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে, পানি না ছুঁইয়া মাছ ধরাই যাহাদের একমাত্র পলিটিক্স এবং মাঝে মাঝে "লড়িয়া লইব" এই বাচনিক হুঙ্কার-আস্ফালন যাহাদের সঙ্কল্প-সাধনার একমাত্র অবলম্বন। সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাকুলতা যদি সত্য সত্যই ইহাদের থাকিত, তাহা হইলে ইহারা বর্ণপরিচয়-বোধোদয় মারফৎ শনৈ শনৈ অগ্রসর হইত, একেবারে একদিনে অকস্মাৎ পোষ্টগ্রাজুয়েট ডিগ্রী আয়ত্ত করিবার অলীক স্বপ্নে মত্ত হইয়া নিরীহ জনসাধারণের ব্যাপক অপঘাত-মৃত্যু ও সর্বনাশের কারণ হইত না।

• • •

যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা ধামাচাপা দাও—ইহা কখনই ন্যায়সঙ্গত বিচার হইতে পারে না। ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিবারণের জন্য আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনার বিশদ বিবৃতি সহসা-আক্রান্ত জনসাধারণের জানা একান্ত আবশ্যক। আমরা জানি, মিথ্যার বেসাতিতে কখনই মঙ্গল হয় না; কিন্তু কলিকাতার রাস্তায় ঘাটে পাঁচ হাজারের অধিক মৃতদেহ তো কল্পিত নয়, কুড়ি হাজার অল্পবিস্তর আহত মানুষ মিথ্যা নয়, শত শত নিখোঁজ পুরুষ ও নারী অলীক নয় এবং কোটি কোটি টাকার দগ্ধ ও লুণ্ঠিত সম্পত্তি শুধু কথার তোড়ে ধোঁয়া হইয়া যাইবে না। ক্ষয় ও ক্ষতির বিয়োগ-বেদনা দগদগে ঘায়ের মত সত্য হইয়া আছে, অকারণ মৃত্যুর আতঙ্ক আমাদের মনে বাসা বাঁধিয়াছে,—আমরা সহস্র উৎপীড়িত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে জানিতে চাই, ইহাদের অবলম্বিত নৃশংসতার যথার্থ স্বরূপ কি, কয়েকদিনের বিকৃত প্রচার চিরন্তন মানবীয়তাকে কক্ষচ্যুত করিয়া কতখানি পাশবিক জিঘাংসার উদ্রেক করিতে পারে, প্রতিবেশী হিসাবে ভিন্নধর্মাবলম্বীর কাছ হইতে বিপন্ন ব্যক্তিরা কতখানি আশ্রয় ও সাহায্য লাভ করিতে পারে, আইন ও শৃঙ্খলার নামে নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর আমরা এইরূপ অবস্থায় কতখানি নির্ভর করিতে পারি। ব্যাপক হত্যা ও লুণ্ঠনের যে বীভৎস ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল, তাহাতে বাংলার গবর্নর ও মন্ত্রীমণ্ডলী, মেয়র, পুলিস কমিশনার, পুলিস ও সামরিক বিভাগ, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেন্ট, কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফিরিঙ্গি ও আম্বেদকরী সম্প্রদায়, অবাঙালী ও বাঙালী নেতা এবং দালালদের কতখানি হাত ও সহযোগিতা ছিল, কলিকাতার নাগরিক হিসাবে আমরা তাহার যথার্থ সংবাদ জানিতে চাই। আমরা জানিতে চাই, বাংলা গবর্মেণ্ট যথেষ্ট কারণ সত্ত্বেও শুক্রবারেই সামরিক বিভাগকে আহ্বান করেন নাই কেন; জানিতে চাই, পুলিস ও সার্জেণ্টরা চোখের সামনে লুণ্ঠন ও হত্যা ঘটা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় ছিল কেন; জানিতে চাই, শেষোক্তেরা লুণ্ঠনে যোগ দিয়াছিল কি না; জানিতে চাই,

হত্যা ও লুণ্ঠন কার্যে সরকারী লরি ও ভ্যান ব্যবহৃত হইয়াছিল কি না; জানিতে চাই, রেডক্রস চিহ্নের আড়ালে কোনও কোনও ক্ষেত্রে জঘন্য শয়তানি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কি না; জানিতে চাই, কলিকাতার বিভিন্ন থানার অফিসার-নিয়োগের সহিত ১৬ আগষ্টের পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের কোনও যোগ আছে কি না; জানিতে চাই, বহিষ্কৃত গুণ্ডাদের চাঁদা করিয়া কলিকাতায় আনা হইয়াছিল কি না; জানিতে চাই, পূর্ব হইতেই হাজার হাজার লোকের রেশন মজুদ রাখা হইয়াছিল কি না! বাংলা দেশে যে গবর্নর ও মন্ত্রীমণ্ডলীর শাসনে এই বীভৎসতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহারা এখনও বজায় আছেন, তাঁহাদের ক্ষমতায় বা অক্ষমতায় অনুরূপ ঘটনার যে পুনরাবৃত্তি হইবে না, সে সম্বন্ধে আমাদিগকে স্বয়ং বড়লাট বাহাদুরও নিঃসংশয় করেন নাই; সুতরাং ভবিষ্যতে আত্মরক্ষার কাজে আমাদিগকে কি সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা বিভিন্ন ঘটনার বিশদ বিবৃতির সাহায্যেই আমরা নির্ধারণ করিতে পারিব। তিন দিনের অরাজকতা আমাদিগকে যে সংহতি দান করিয়াছে, তাহা বজায় রাখিতে হইলে সমস্ত ব্যাপারের ব্যাপক প্রচার আবশ্যক, মিথ্যা গুজবের প্রচার নয়, যতদূর সম্ভব সত্য ঘটনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতেই হইবে। বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রকাশ করিয়া এবং সকল বিপদ উপেক্ষা করিয়া নিজেরা অনুসন্ধান করিয়া যে সকল পত্রিকা কলিকাতার স্মরণীয় স্বজন-আহবের ভবিষ্যৎ সত্য ইতিহাসের উপকরণ লিপিবদ্ধ করিতেছেন, তাঁহারা মহৎ কার্যই করিতেছেন। ইঁহাদের চেষ্টার ফলে বহু নিরুদ্দিষ্ট ও নিখোঁজ ব্যক্তির ক্রমশ সন্ধান মিলিতেছে, ইহাও কম কথা নয়।

• • •

আর যাঁহারা নিজেদের প্রাণসংশয় করিয়া এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মৃত্যুকে বরণ করিয়া জাতিধর্মনির্বিশেষে বিপন্ন ও শরণাগতকে আশ্রয় দিয়া, নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া অথবা সেবাশুশ্রূষা করিয়া রক্ষা করিয়াছেন বা রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আজ প্রণাম নিবেদন করিতেছি। এই দুর্যোগময় বিভীষিকার মধ্যে ইঁহাদের পরিচয় পাইলাম, ইহাই আমাদের পরম লাভ। বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ডাক্তার ও নার্স এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতার শিখ সম্প্রদায় বিপন্ন ও বিপর্যস্ত কলিকাতার প্রাণবায়ু রক্ষা ও সঞ্চারের কাজে যে মহৎ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আমাদের চিরদিন স্মরণে থাকিবে।

• • •

এতখানি আত্মীয়রক্তমূল্যে আমরা কোন্ শিক্ষা লাভ করিলাম?—এই প্রশ্নই সকলের মনে জাগিতেছে। বৃহত্তর ভারতবর্ষ বা বাংলা দেশের হিসাব না করিয়া আমরা যদি ক্ষুদ্র কলিকাতার কথাই ধরি, তাহা হইলেও এ কথা আমাদের মানিতে হইবে যে, হিংসা-

বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসই যদি অর্ডার অব দি ডে হয় এবং মুসলমান-অধ্যুষিত মধ্য-কলিকাতা হইতে হিন্দুরা যদি উত্তরে বা দক্ষিণে স্থান-পরিবর্তনও করে, তাহা হইলেও কাহারও নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। উত্তর-দক্ষিণের চাপে মধ্য, এবং শহরতলীর চাপে উত্তর-দক্ষিণকে সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতে হইবে। তাহা ছাড়া ব্যবসায়কেন্দ্রে বা চাকুরিস্থানে কোনও পক্ষেরই আগমন-নিষ্ক্রমণের নিরাপদ রাস্তা নাই। একে অন্যকে এই অবস্থাতেও বাদ দিয়া চলিতে পারিতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে বয়কট বা স্থানত্যাগের প্রশ্ন অবান্তর। সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও এতদিন এক সম্প্রদায় শুধু উগ্রতা ও সংহতির বলে অন্য সম্প্রদায়কে আতঙ্কিত রাখিয়াছিল, এইবারে মাত্র প্রকাশ পাইল, সে ভয় মিথ্যা। প্রয়োজন হইলে অপর পক্ষও উগ্র ও সংহত হইয়া উঠিতে পারে এবং তাহারাও কম নির্মম হইতে জানে না। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে নির্মূল করিয়া নিশ্চিন্তে বসবাস করিবে, সে ধারণা যে আকাশ-কুসুম মাত্র ১৬ই আগষ্ট তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। বিভেদ-বিদ্বেষ, হিংসা-অপঘাত, পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের পথে যে তৃতীয়-পক্ষ-রচিত সমস্যার সমাধান নয়, এইবারে সুস্থ ও স্বস্থ হইয়া স্থায়ী দুই পক্ষই তাহা বুঝিতে পারিবে। সম্প্রদায়গতভাবে উত্তরোত্তর সংহতি শক্তি, শিক্ষা ও সমৃদ্ধিলাভের পরিপূর্ণ চেষ্টা করিয়াও প্রতিবেশী হিসাবে দুই সম্প্রদায়কেই প্রীতি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে বাস করিতেই হইবে। ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই। হিন্দুরাও যে প্রয়োজন হইলে স্বেচ্ছায় মরিতে ও মারিতে পারে, বহু শতাব্দীকালের মধ্যে ইহা তাহারা দেখাইতে পারে নাই বলিয়াই ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানেরা কারণে অকারণে তাল ঠুকিয়া চোখ রাঙাইয়াছে, অথবা উৎপীড়ন করিয়াছে। তাহাদের এবারকার চরম নির্যাতন মূষিকপ্রবৃত্তিসম্পন্ন নিরীহকেও খুনের দলে পরিবর্তিত করিয়াছে, আর তাহারা অবাধে মার খাইয়া গুহাশ্রয় করিবে না। ইসলামের চিরন্তন যোদ্ধৃবৃন্দ এবারে প্রেম ও সম্মানের সহিত ভগবদ্গীতার উপাসকদের হাতে হাত মিলাইতে পারিবেন, ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবার কারণ আর ঘটিবে না।

এই প্রসঙ্গে বহুকাল পূর্বে লিখিত মহাত্মা গান্ধীর সুচিন্তিত মন্তব্য সকলকে স্মরণ করিতে বলি। তিনি বলিতেছেন—

Hindus think that they are physically weaker than the Mussalmans. The latter consider themselves weak in educational and earthly equipments. They are now doing what all weak bodies have done hitherto. This fighting, therefore, however unfortunate it may be, is a sign of growth. It is like the Wars of the Roses. Out of it will rise a mighty nation.—*Young India* 9. 9. 26

The union that we want is not a patched-up thing but a union of hearts based upon a definite recognition of the indubitable proposition that Swaraj for India must be an impossible dream without an indissoluble union between the Hindus and Muslims of India. It must not be a mere truce. It cannot be based upon mutual fear. It must be a partnership between equals, each respecting the religion of the other.—*Young India* 6. 10. 20

• • •

অনেক কথাই মনে জাগিতেছে, কিন্তু এই প্রসঙ্গ বিস্তার করিয়া লাভ নাই। ভোটাধিক্যতায় আমরা—বাংলা দেশে নিগৃহীত সম্প্রদায়—সরকারী অর্থ ও শক্তির ন্যায়-সঙ্গত অধিকার দীর্ঘকাল হইতেই পাইতেছি না। বিদেশীয় ও বিজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির চাপে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন; ইংরেজীর আক্রমণ কাটিতে না কাটিতেই অবাঙালীদের কৃপায় উর্দুর আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। বাংলা দেশের কৃষি ও বাণিজ্য পর্যন্ত অবাঙালীদের চাপে বিপন্ন। বাংলা দেশের চাষী জেলে জোলা তাঁতি নাপিত নিকারী ছুতোর মুচি হাড়ি ডোম পোয়ালা সকল সম্প্রদায়ই ধীরে ধীরে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। দুর্ভিক্ষ অনশন ম্যালেরিয়া ও নানা মহামারী আমাদের নিত্য সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর সাম্প্রদায়িকতার নামে ১৯২৬ সাল হইতে শহরে ও মফস্বলে আমাদিগকে মারিবার ব্যাপক আয়োজন মরার উপর খাঁড়ার ঘা মাত্র; নারী-হরণের মামলা না হয় আপাতত মুলতুবিই রাখিলাম। সুতরাং বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, পশ্চিমী গোঁফ আতর ও জবানের মোহে স্বজনকে উৎপীড়ন করিয়া তাঁহারা শেষ পর্যন্ত যেন নিজেরাও বিপন্ন না হন। ছুরি-ছোরা-ডাণ্ডার কারবার বাংলা দেশের কোনও দিনই নয়; আমরা নিরীহ শান্তিপ্রিয় জাতি, পরস্পরকে পাঁচালী ও গীত শুনাইয়া, বিচিত্র রঙে আঁকা পট দেখাইয়া দীর্ঘকাল একত্রে বাস করিয়াছি, উর্দুজবান ও আমিরী চালকে আমরা কোনও দিনই প্রীতি ও সম্ভ্রমের চোখে দেখি নাই। উহারা আজ আসিয়া আমাদিগকে উস্কাইয়া পরস্পর যুদ্ধোন্মুখ করিয়া মজা দেখিতেছে, বাংলার লুঠের মালের পনেরো আনা ভাগ লইতেছে, নানা অপকৌশলের সাহায্যে বাংলার শাসনভার লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া বাঙালীর সর্বনাশ করিতেছে। এবারের নিধনযজ্ঞ কাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, একটু অনুসন্ধান করিলেই তাহা তাঁহারা জানিতে পারিবেন। কিন্তু অনুষ্ঠাতাদের কাহারও গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগে নাই, তাঁহাদের আমদানি-করা গুণ্ডারা বাংলা দেশের লুঠের মাল লইয়া বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছে, ধনেপ্রাণে মরিবার বেলায় মরিয়াছি—আমরা, নিরীহ বাঙালী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়। এই অকারণ মৃত্যু মূল্যে আমরা কি এই সত্যটি লাভ করিব না যে, বাঙালীর পক্ষে হিংসা ও অবিশ্বাস বাঁচিবার পথ নয়, প্রীতি ও বিশ্বাসই তাহাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করিয়াছে!

• • •

এই ব্যাপক নরমেধযজ্ঞের যাহারা উদ্যোক্তা হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালীরই তাহাদের চিনিয়া রাখার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহারা কখনই হিন্দু-মুসলমান কোনও বাঙালীরই হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। স্বদেশ ও স্বসমাজ হইতে দূরে থাকিয়া তাহারা মজা দেখিয়াছে ও লুঠের মালে ভাগ বসাইয়া অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। কলিকাতা শহরে এই

তাণ্ডবলীলা জুড়িয়া দিয়া তাহারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পায়ের তলার মাটি ধরিয়াই টান দিয়াছে, আকস্মিক ভূমিকম্পের এক ধাক্কায় বাঙালী সমাজের সমস্ত ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া গেল। মরিল কাহারা? মুচি মেথর মুদ্দোফরাস দোসাদ কোচোয়ান কুলি গাড়োয়ান রাজমিস্ত্রী রিক্‌শাওয়ালা বিড়িওয়ালা চাষী ব্যাপারী জেলে ও মাঝিরা। তাহারা শুধু প্রাণে মরে নাই, তাহাদের উপর যাহাদের নির্ভর ছিল তাহাদিগকে পেটে মারিয়া গিয়াছে। যাহারা প্রাণে বাঁচিয়া আছে, তাহারাও রুজিরোজগার ছাড়িয়া হয় পলাইয়াছে, নয় প্রাণভয়ে এখনও রোজগারের সন্ধানে বাহির হইতে পারিতেছে না; তাহা ছাড়া সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দরুন পরস্পর অসহযোগের চেষ্টাও চলিতেছে। ফলে কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, সাধারণ নাগরিক জীবন পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়াছে। ইহার সর্বনাশা পরিণাম দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। অচিরাৎ সম্প্রীতি ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমরা সেই পরিণামের মধ্যেই অদূরভবিষ্যতে নিক্ষিপ্ত হইব। তখন যাহারা চেষ্টা করিয়া এবং প্রচার করিয়া এই বিপর্যয় ঘটাইয়াছে, তাহারা নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে ও নিরুদ্বেগে ঐশ্বর্য ও অট্টালিকার মধ্যে নিজেদের কৃতিত্বের কথা ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে; আর দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানেরা দুর্ভিক্ষ মহামারী ও মৃত্যুর মধ্যে আবার পরস্পরের আশ্রয় খুঁজিবে, শ্মশানে ও কবরে তখন কোনই ভেদ থাকিবে না। এই অব্যর্থ পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া জনসাধারণ এখনও যদি নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি ফিরাইয়া আনিয়া এই সব দুষ্কৃতিকারীদের তফাতে রাখে, তবেই তাহারা রক্ষা পাইবে।

• • •

সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণগুলিতে টুকরা টুকরাভাবে এক বিরাট ষড়যন্ত্রের যে আভাস পাওয়া যাইতেছে, অবিলম্বে এক ট্রাইবিউনাল গঠন করিয়া সেই ষড়যন্ত্রের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রস্তুত করা প্রয়োজন। মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তি লইয়া যাহারা ছিনিমিনি খেলিতে চাহিয়াছিল, তাহারা সমাজে ও রাষ্ট্রে যত প্রতিষ্ঠাসম্পন্নই হউক, নির্মম বিচারে তাহাদের চরম শাস্তি বিধান করিতেই হইবে। যতদিন তাহা না হইবে, ততদিন কেহই নিরাপদ নহে।

• • •

আমাদের এক দেশসেবক কর্মীবন্ধু এই প্রসঙ্গে যে চিঠিখানি লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়াই আমরা এই লজ্জাকর প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। তিনি হাতেকলমে কাজ করিয়া থাকেন এবং এবারেও সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সুতরাং কিছু বলিবার অধিকার তাঁহার আছে। ৩০।৮।৪৬ তারিখে তিনি লিখিতেছেন—

"বাংলার বর্তমান মন্ত্রীসভার প্রভাবে কিছুকাল থেকে নগ্নভাবে হিন্দু ব'লে হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ এবং মুসলমানের প্রতি প্রীতি বর্ষিত হচ্ছিল। তার ফলে এখানে বাঙালী হিন্দুর

ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, গবর্মেণ্টের কাছে কোন বিপদেই সাহায্য পাওয়া যাবে না, নিজের শক্তিতেই নিজেকে বাঁচতে হবে। আত্মশক্তির রাজসিক এবং তামসিক উন্মেষের ব্যাপারে ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন এবং ১৯৪৫-এর নভেম্বর ও ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে কলিকাতার ঘটনাবলিও আংশিকভাবে সাহায্য করেছিল।

"১৬ই আগষ্ট যখন মুসলমান জনতা কলকাতার বিভিন্ন পল্লীতে মিছিলের পিছনে পিছনে লুঠতরাজ আরম্ভ করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা আত্মরক্ষার জন্য ইট লাঠি ইত্যাদিতে সজ্জিত হয়ে পাড়া পাহারা দিতে আরম্ভ করে। সেই রাত্রি থেকেই বিভিন্ন জায়গায় নরহত্যা, গৃহদাহের সংবাদ আসতে আরম্ভ করে। পরদিবস থেকে উভয় সম্প্রদায়, আত্মরক্ষা করছি—এই বিশ্বাসে নির্মমভাবে পরস্পরকে সংহারের চেষ্টায় প্রমত্ত হয়ে ওঠে। মোট বোধ হয় পাঁচ হাজারের ওপর লোক মারা গেছে, আহতের সংখ্যা বহুগুণ বেশি।

"এইটুকু দেখা গেল, আশঙ্কার তমসায় যখন মানুষের মন আচ্ছন্ন হয় তখন তার সকল শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে নগ্ন পাশবিক রূপ ফুটে ওঠে। সেই পশু-অবস্থার প্রেমের কথা শোনে না, ভয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হিংসায় ধ্বংসই করতে চায়। হয়তো উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচার করলে কারুর মধ্যে লোভ বেশি, নিষ্ঠুরতা বা জঘন্যতায় কেউ কিছু কম, কেউ কিছু বেশি; কিন্তু উভয়েরই যখন নগ্ন রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তখন সেই রূপের মধ্যে তারতম্যের সন্ধান হয়তো না করাই ভাল।

"একটা ভরসার কথা এই। হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে আত্মরক্ষার শক্তি, আত্মবিশ্বাসের বোধ, অতর্কিত আক্রমণেও সংহত হওয়ার বীর্য দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়, ক্ষণেকের উন্মত্ততার পরে লোকে কিছু লজ্জিত হয়ে বলেছে, আত্মরক্ষার এ ছাড়া তো উপায় ছিল না। তৃতীয়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরস্পরকে মানুষ হিসাবে যারা সাহায্য করেছেন, তাদের দিকেই সবাইকার দৃষ্টি ধাবিত হয়েছে।

"অর্থাৎ, ঝড়ের ফলে আমাদের সভ্যতার যে আলগা আবরণ গায়ের উপরে ছিল, সেটি উড়ে গিয়ে নগ্নভূমি প্রকাশ পেয়েছে। সেই নগ্নভূমিতে এরই মধ্যে শ্যামল তৃণের আবির্ভাব হয়েছে। ধানের জমিতে শস্যরোপণের পূর্বে, চাষের সময়ে, তার নগ্ন রূপই প্রকাশ পায়। সেই জমিতে শুধু তৃণের মত লঘু আবরণ আমরা চাই না, শ্যামল তরুরাজির বিস্তীর্ণ ও গভীর আবরণ সৃষ্টি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যে বিভিন্ন সংস্কৃতির আস্তরণ লঘুভাবে হিন্দু বা মুসলমানের চিত্তকে ঢেকে ছিল, ক্ষণেকের ঝড়ে তা উড়ে গেছে, তার জায়গায় নূতন তরু রোপণ ও বৃদ্ধির চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। সেই তরুর মূল থাকবে আমাদের অন্তরে যে পশু-অবস্থার আছে তার ঐক্যের মধ্যে অর্থাৎ জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের সমতায়; কিন্তু সেই তরু ঊর্ধ্বে মাথা তুলে যেন আকাশকে

স্পর্শ করতে পারে, উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত জীবনকে শান্তি ও সম্পদ বিতরণ করতে পারে।

"সেই তরুর রোপণ ও বৃদ্ধিতে আমরা কেমনভাবে সহায়তা করব, সেই চিন্তা যেন আমরা প্রত্যেকে সর্বক্ষণ করতে পারি।"

—

সহজ বুদ্ধির বশে যদিও বুঝিতে পারিতেছি, কলিকাতার মারণ-যজ্ঞ হইতে গুরুতর ঘটনা এই কালের মধ্যে ভারতবর্ষের বুকে ঘটিয়াছে, তথাপি প্রত্যক্ষই পরোক্ষ বৃহৎকে আমাদের চোখে স্বমর্যাদায় মহিমান্বিত হইতে দিতেছে না। ভারতবর্ষ আত্মকর্তৃত্বলাভের পথে যে প্রথম সোপান অতিক্রম করিল, এই ঘটনায় আজ ভারতবর্ষের আপামরসাধারণ সকলেরই আনন্দ করিবার দিন। কিন্তু নানা সাময়িক উত্তেজনায় সেই সুবিপুল সম্ভাবনার মধ্যে আমাদের সোনার বাংলা দেশকে এখনও দেখিতে পাইতেছি না; "এ" গ্রুপের পট-ভূমিকায় "সি" গ্রুপের গৃহবিবাদ-জর্জরিত চিত্রটি তেমন গৌরবে ফুটিয়া উঠিতেছে না। হয়তো একদিন উঠিবে, কিন্তু কবে কেমন করিয়া তাহা ঘটিবে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তথাপি ভারতবাসী হিসাবে আজ এই পরিপূর্ণ সম্ভাবনার দিনটিকে আমরা বরণ করিতেছি। বিনা আড়ম্বরে আজ যে কতবড় একটা পরিবর্তন ঘটিয়া গেল তাহা আমরা হয়তো উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, কিন্তু গত বাষট্টি বৎসর ধরিয়া ইহাই আমরা কামনা করিতেছিলাম এবং ইহারই জন্য আমাদের সাধনা ও আত্মত্যাগের সীমা-পরিসীমা ছিল না। ইহার জন্য ভারতবাসী দলে দলে কারাবরণ করিয়াছে, ফাঁসিকাঠকে ভয় করে নাই, সর্ববিধ নিগ্রহ উৎপীড়নকে উপেক্ষা করিয়াছে। লীগপন্থীদের আপাতবিরোধিতাসত্ত্বেও এ কথা ঐতিহাসিককে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ আর কখনই এমন অখণ্ড রূপ গ্রহণ করে নাই। দীর্ঘ বাষট্টি বৎসরের সকল ভারতবাসীর প্রাণপণ সাধনা আজ যে আকারে ফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহা হয়তো আমাদের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ নয়— তবু একটা রূপ তো বটেই। অন্তবর্তীকালীন-শাসন দীর্ঘমেয়াদী-শাসনে যদি পর্যবসিত হয় এবং ভারতীয় শাসনব্যবস্থা যদি শেষাশেষি ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের ঐক্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই আমাদের দীর্ঘকালের সাধনা চরম সফলতা লাভ করিবে। সূত্রপাত যখন হইয়াছে, আমরা ততদিন সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে পারিব।

—

এই ব্যাপক হত্যা ও মৃত্যুর মধ্যে একটি বিদেশীয় এবং দুইটি স্বদেশীয় মৃত্যুর গভীর শোকাবহতা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। এইচ. জি. ওয়েল্‌সের মৃত্যু বিদেশে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের মৃত্যু অত্যন্ত আকস্মিক। 'সবুজ পত্রে'র কর্ণধাররূপে তিনি ভাষা ও ভঙ্গীর দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরাইবার কাজে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই

ভঙ্গীর মধ্য দিয়াই তিনি চিরদিন জীবিত থাকিবেন। তাঁহার সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথকেও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চারিদিকে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ ও গল্পগুলি খুব গভীর না হইলেও হালকা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, স্থানে স্থানে ক্ষুরধার। বার্নার্ড শয়ের মত বচনে অনন্যসাধারণ হইবার একটা ঝোঁক তাঁহার ছিল। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে আমরা "বীরবলের আত্ম-পরিচয়" (সচিত্র) প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

"সবুজপত্র প্রকাশ করি এবং বাঙলা লেখা আমার নেশা হয়ে ওঠে। আজও তার জের টানছি। আমার লেখার মধ্যে যদি একরোখামী থাকে তো তার কারণ আমি বাঙ্গাল; যদি বাক্‌চাতুরী থাকে তো তার কারণ আমি কৃষ্ণনাগরিক; আর যদি প্রাণ থাকে তো তার কারণ আমি আকৈশোর রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রাণের স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়েছি।"

• • •

লালগোলার মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাংলা সাহিত্যের সর্বোত্তম সুহৃদ ছিলেন, স্বর্গীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর তিনি সমধর্মী। এই দুই মহৎ ব্যক্তির সহায়তায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্তমান প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইঁহারা উভয়েই পরিষদের "বান্ধব" ছিলেন। লালগোলার মহারাজ বর্তমান পরিষৎ-মন্দিরের দ্বিতলটি নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, লালগোলা-তহবিল গঠন করিয়া বহু মূল্যবান প্রাচীন বাংলা গ্রন্থাবলী মুদ্রণ সম্ভব করিয়াছিলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুমূল্য গ্রন্থাগারটি পরিষদের জন্য তিনিই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই যে তাঁহার দান নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে, তিনি মুর্শিদাবাদের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই শতায়ু দানবীরের মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন সত্যকার সুহৃদ হারাইল।

—

ডাক ধর্মঘট এবং কলিকাতায় মারণ তাণ্ডবের দরুন আমাদের যে বিপর্যয় ঘটিয়াছে, তাহাতে যথাসময়ে পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হইল না। এখন পর্যন্ত এক মাস পূর্বের চিঠিপত্র আমাদের হস্তগত হইতেছে। ইচ্ছা ছিল পূজার ছুটির পূর্বেই আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা বাহির করিব, কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। আশ্বিন সংখ্যা বিশেষ "শারদীয়া সংখ্যা" হইয়া পূজার পূর্বে বাহির হইবে। পূজার ছুটির পরে কার্তিক সংখ্যা বাহির হইবে। শারদীয়া সংখ্যায় শ্রীমতী অমলা দেবীর সুবৃহৎ গল্প "সমাধান" প্রকাশিত হইবে। কার্তিকে বর্ষারম্ভে 'বনফুলে'র নূতন উপন্যাস "অগ্নি" বাহির হইবে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।